০১. চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি

তিব্বতী সূত্রে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম পাওয়া যাচ্ছে-জ্বালনধারা–তপ্তজল সমন্বিত অঞ্চল। এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধ সিদ্ধ বালপাদ জ্বালন্ধরী নাম প্রাপ্ত হন। এরই অপর নাম হাড়িফা। ঝাড়দার হাড়ির কাজ করেছিলেন বলেই এই নাম। হয়তো অগ্নিতপ্ত জল ধারণ করে বলেই স্থানটি জ্বালন্ধর নামে পরিচিত ছিল। সীতাকুণ্ডে ও বাড়বকুণ্ডে এখনো তপ্তজল পর্বতগাত্র থেকে নিঃসৃত হয়। এরই আরবি-ফারসি নাম সম্ভবত সামন্দর। সাম –(অগ্নি) অন্দরে (অন্তর< অন্দর) আছে যে স্থানে সেটিই সামন্দর।

সামন্দর নামের প্রথম উল্লেখ পাই, ইবন খুর্দাদবেহ-র বর্ণনায়। ইনি এ অঞ্চলকে রুহম বা রুহমি রাজার শাসনভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সামন্দরের দ্বিতীয় উল্লেখ মেলে হুদুদুল আলম গ্রন্থে। এখানে রাজার নাম দহ্নম। এই দহ্নম ও রুহম-ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে, একই নামের বিকৃতি। দহ্নম> দহম> দম্ম> ধর্ম। ইনি বঙ্গাধিপ ধর্মপাল। হোদীওয়ালাও এ মত পোষণ করেন। আর এক কিংবদন্তি এই যে, আরাকানরাজ চূড়সিংহ চন্দ্র (Chulataing Tsandaya) ৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে একটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করান এবং তাতে Tsit-Tat Gung-যুদ্ধ করা অনুচিত –এই বাণী উত্তীর্ণ হয়। এরই বিকৃত রূপ চাটিগাঁও। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মতে চৈত্যগ্রাম থেকে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম-এর উৎপত্তি। হিন্দুদের ধারণা চট্ট (কুলীন ব্রাহ্মণ)-দের নিবাস বলে চট্টল> চট্টলা, কিংবা চট্টগ্রাম হয়েছে। মুসলমানদের বিশ্বাস, শাহ বদর আলম চাটি (মৃত্বর্তিকা) জ্বালিয়ে জ্বীন-পরীর কবল থেকে অঞ্চলটিকে মুক্ত করেন বলে, স্থানটি চাটিগ্রাম বা চাটিগাঁও নামে অভিহিত হয়েছে। Bernonilli বলেছেন–আরবি শাত (বদ্বীপ) ও গঙ্গা (নদী) থেকে, অর্থাৎ গঙ্গার মুখস্থিত বদ্বীপ অর্থে আরব বণিকেরা একে শাৎগাঙ> শাৎগাঁও নামে অভিহিত করত এবং উচ্চারণ বিকৃতির ফলে চাটগাও চাটিগাঁও, এবং সংস্কৃতায়নের ফলে চট্টগ্রাম হয়েছে বলে অনুমিত। District Gazetteer: Chittagong-এ O Malley অনুমান করেছেন, সংস্কৃত চতুগ্রাম বা চারিগ্রাম থেকে চাটিগাঁও নামের উৎপত্তি। আহাদিসুল খাওয়ানীন লেখক খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খানের মতে হোসেন শাহের (১৪৯৩ ১৫১৯ খ্রী.) পুত্র নুসরৎ শাহ ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করে এর নাম দেন ফহ-ই-আবাদ। এবং শায়েস্তাখান ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম অধিকার করে আওরঙজেবের অভিপ্রায়ক্রমে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পর্তুগীজ বণিকেরা Porte grando বলেই এর পরিচয় দিত। আল্ ইদ্রিসী কর্ণফুলীর নামানুসারে একে কর্ণবুল নামে আখ্যাত করেন।

.

০২. দেশ-পরিচয়

প্রাচীনকাল থেকেই সামুদ্রিক বন্দর বলে চট্টগ্রামের ইতিহাস ঋজু থাকেনি। রক্তে স্বাতন্ত্র রক্ষা করাও দেশবাসীর পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি। নানা জাতির সংমিশ্র সঙ্কর সমাজের উদ্ভব যে গোড়া থেকেই হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান সম্ভব। এমনি সঙ্কর সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনও বৈচিত্র্যে জটিল হয়ে উঠে। ইতিহাসবিহীন প্রাচীন যুগের কোনো সংবাদ আমাদের কালে এসে পৌঁছেনি। তবে পরোক্ষ তথ্যের আলোকে একটি কল্পচিত্র আঁকা যায়।

ঋগ্বেদের আমলে আজকের বাঙলা দেশের অধিকাংশ ছিল সমুদ্র। আরো অনেক পরে শুক্লযজুর্বেদের যুগেও গণ্ডকী নদীর পূর্বদিক ছিল জলপ্লাবিত। মহাভারতিক কালেও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ ছিল সমুদ্রে লীন। পর্যটক স্ট্রাবোর ভারত ভ্রমণ কালে (১৮-২৪ খ্রী.) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্যে বহু নগরের চারদিকে বাধ ছিল। হিউএয়ন সাঙও সমতট কামরূপের মধ্যাঞ্চলে প্রায় হাজার ক্রোশব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তবু বাঙলা ও আসাম যে মহাভারতিক যুগে বসতিবহুল ছিল তা নিশ্চিত। পুরে বসুদেব, ভগদত্তের প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম)৬ ঐ যুগের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রী. পূ. ৭ম শতক) পুরে জনগণকে দস্যু বলা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে অনার্য বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চের জাতির উল্লেখ রয়েছে। এতে অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে খ্রীস্টপূর্ব সাত শতকেও এদেশে জনবসতি ছিল এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আর্যসমাজে আহৃত হয়েছে।

বৌধায়নসূত্রে অঙ্গ ও মগধের লোকেরা অভিহিত হয়েছে সংকীর্ণযোনি (তথা অংশত আর্য বা আর্যরক্ত সম্পৃক্ত) বলে। আর কলিঙ্গ, পুণ্ড ও বঙ্গদেশকে তখনো আর্য-বর্জিত অঞ্চল বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এদেশে আসলে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এর পরে রচিত একটি শ্লোকে দেখতে পাই তীর্থদর্শনার্থ অঙ্গে, বঙ্গে ও কলিঙ্গে যাওয়ার বিধান রয়েছে। এতে বোঝা যায়, সমাজক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলত্রয়ের লোক ঘৃণ্য হলেও তাদের দেশের স্থানবিশেষ তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এর মধ্যে বাঙলায় আর্য আর আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের প্রমাণ, অন্তত আভাস মেলে। সম্ভবত বাঙলার গঙ্গাসাগর ও উড়িষ্যার বৈতরণী তীরই এই অনুক্ত তীর্থক্ষেত্র।

দুটো লিপির সাক্ষ্যেও প্রমাণিত হয় যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এদেশে আর্য-প্রভাব দৃঢ় ও গাঢ় হয়ে উঠেছে। এর একটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এবং মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত এবং অপরটি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের, প্রাপ্তিস্থান নোয়াখালির মিলুয়া গাঁ। এছাড়া বাঙলার বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত কুষাণ আমলের মুদ্রাও আর্যাবর্ত তথা উত্তরভারতের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিঃসংশয় প্রমাণবাহী। এসব থেকে সহজেই অনুমান করা চলে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই বাঙলা দেশে চালু হয়েছে। আর্যবসতি না থাকলে এ কিছুতেই সম্ভব হত না। সিংহলী মহাবংশ বর্ণিত কাহিনীসূত্রে জানা যায়– খ্রস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গে রাজা ও রাজ্য ছিল এতে বাঙলার বর্বরোত্তর যুগের আভাস পাই।

.

০৩. চট্টগ্রাম-আরাকানের জনগোষ্ঠী

বিদ্বানদের মতে অস্ট্রো-এশীয় এবং ভোট-চীন গোত্রীয় মানুষই সম্ভবত চট্টগ্রাম ও তার সংলগ্ন আরাকানের খ্রীস্টপূর্ব যুগের আদি অধিবাসী। আর খ্রীস্টীয় সনের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও বৌদ্ধেরা তাদের উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসব অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। এভাবে খাসী ও কুকী চীনাদের সাথে (অস্ট্রো-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়-মোঙ্গল-আলপাইনীয়-নর্ডিক মিশ্রণে গঠিত) আর্যজাতির ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। আরাকানী সূত্রে ১৫ জানা যায়,

আরাকানে দশ কিংবা বারো শতকের পূর্বে বর্মী অনুপ্রবেশ ঘটেনি। পক্ষান্তরে উত্তরভারতিক আর্যেরা খ্রীস্টীয় সনের গোড়া থেকেই আরাকানে বসতি নির্মাণ করে। আরাকানে প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ও পরে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হয়। এর পুরোনো রাজধানীর নাম দিন্নাওয়াতী (ধান্যবতী বা তৃণবতী) এবং বেসালি (বৈশালী), চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সংস্কৃত ও বিকৃত সংস্কৃত নাম, সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, আরাকানীদের মাগধী১৬ বলে আত্মপরিচয় দান, বৃষ মূর্তি, ধ্বজ ও লাঞ্ছন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের ও ভারতিক জনবসতির স্বাক্ষর বহন করে। সম্ভবত বিহারের বৈশালী থেকে আগত চন্দ্ররাজা পিতৃভূমের নামানুসারে রাজধানীর নাম বৈশালী রাখেন।১৭ আরাকানের ইতিহাসের আলোকে চট্টগ্রামের পুরোনো ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। Phayre ও Harvey–র সংযোজিত তালিকায় দেখা যায় চন্দ্রবংশীয়দের রাজত্বকাল সাময়িক ছেদ থাকলেও ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি প্রসারিত।

.

০৪. ইতিহাসের দূরাগত ধ্বনি

স্থানীয় কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় মহাভারতিক যুগে কর্ণের পুত্র বিকর্ণ চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন। তার রাজধানী ছিল কাঞ্চন নগর। পটিয়া ও ফটিকছড়ি থানা অঞ্চলে দুটো কাঞ্চনগর আছে, সাতকানিয়া থানায় আছে কাঞ্চনা। এ তিনটেই বিকর্ণের রাজধানীর গৌরব দাবী করে। এছাড়া কিংবদন্তি সূত্রে আর কিছু জানা যায় না।

তিব্বতী সূত্রে জানতে পাই, লামা তারানাথ চট্টগ্রাম পর্যটন করেননি। তিনি ভারতে ও তিব্বতে লোকমুখে শুনে কিংবা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত কাহিনী ভিত্তি করে চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। তবু এর মধ্যে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। সিংহচন্দ্রের প্রপৌত্র বালচন্দ্রের পৌত্র বিমল চন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র (বা গোপচন্দ্র) চট্টগ্রামকেই শাসনকেন্দ্র করেন। তিনিই গোপীচাঁদ-ময়নামতী মানিকচাঁদ গীতিকার নায়ক। জ্বালন্ধরীপা বা হাড়িফা তারই মাতা ময়নামতীর গুরু। এ সময় চট্টগ্রামে তীর্থিক ও বৌদ্ধদের সমান প্রাধান্য ছিল। তাই বৌদ্ধবিহারে ও তীর্থিক মন্দিরে চট্টগ্রাম ছিল আকীর্ণ। তান্ত্রিক মহাযান মতই তখন চট্টগ্রামে চালু ছিল। (পরবর্তীকালে বর্মী-আরাকানী প্রভাবে হীনযান মত প্রাধান্য লাভ করে, আরো পরে হীনযান প্রসূত থেরবাদ চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের ধর্ম হয়ে ওঠে।

এই সময় চট্টগ্রামে জ্বালনধারা ছিল। সম্ভবত সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ডই এই জ্বালনধারা বা তপ্তজল ধারা। এ থেকে আমরা দুটো অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি: এক. সিন্ধুদেশীয় বালপাদ জ্বালন্ধরে বাস করেছিলেন বলে জ্বালন্ধরীপা নামে পরিচিত হন; দুই. জ্বালন্ধর ও সামন্দর (সাম অগ্নি+ অন্দর< অন্তর, অভ্যন্তর) একার্থবোধক হলে আরব ভৌগোলিকদের সামন্দর চট্টগ্রামই।

এমনও অনুমিত হয় যে নালন্দাবিহারের গৌরব ও প্রভাব ম্লান হওয়ার কালে চট্টগ্রামই বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার পণ্ডিতবিহারের খ্যাতিও ছিল আন্তর্জাতিক। এই বিহার আধুনিক সীতাকুণ্ড কিংবা চক্রশালায় ছিল বলে লোকশ্রুতি আছে। আদিনাথ-চন্দ্রনাথ শিবও মূলত বৌদ্ধ দেবতা–তা নামেই প্রকাশ।

দশশতকের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধ তিলযোগী চট্টগ্রামেরই সন্তান। মগধের প্রধান আচার্য নরতোপা চট্টগ্রামে গিয়ে তিলযোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামের ছ্গল রাজা বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। তার দাপট বাঙলা থেকে দিল্লী অবধি অনুভূত হত। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তার বৌদ্ধ-পরীর প্রভাবে মগধে এবং বৌদ্ধগয়ায় ও নালন্দায় নানা সৎকর্ম করেন। বৌদ্ধপণ্ডিত সারিপুত্রের সাহায্যে তিনি বৌদ্ধগয়ায় বুদ্ধপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ছ্গল তারানাথের গ্রন্থ রচনার তিনশ বছর পূর্বে (চৌদ্দশতকের শেষপাদে) বর্তমান ছিলেন।

চট্টগ্রামের পণ্ডিত বর্ণর একটি ভিক্ষুদল নিয়ে তিব্বত পরিভ্রমণে গমন করেন। চট্টগ্রামের আর একজন রাজা ববলাসুন্দর খগেন্দ্রে অবস্থানরত সিদ্ধ শান্তিগুপ্তের কাছে চট্টগ্রামবাসী একদল পণ্ডিত পাঠিয়েছিলেন, এঁরা সেখান থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের অনেক গ্রন্থ চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। ববলাসুন্দরের চার সন্তান ছিল: চন্দ্রবাহন, অতীতবাহন, বালবাহন ও সুন্দর হচি। এরা সবাই বৌদ্ধধর্মের প্রতিপোষক ছিলেন। চন্দ্রবাহন আরাকানে, অতীতবাহন চাকমাদেশে (পার্বত্য চট্টগ্রামে), বালবাহন বর্মায় এবং সুন্দর হচি আসাম-কাছাড়-ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন।

এ থেকে চটল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির আভাস মেলে। পণ্ডিতবিহার এবং তীর্থিকদের সঙ্গে বৌদ্ধভিক্ষুদের শাস্ত্রীয় বিতর্কের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের চট্টগ্রাম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল।

.

০৫. ইতিহাসের ইঙ্গিত

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিংবা শাসনাদি লিপিতে চট্টগ্রামের নাম মেলে না। কিন্তু Strabo-র বর্ণনা ও Periplus of the Erythrean Sea থেকেও বোঝা যায়, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেও চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

পাহাড়পুরে খলিফা হারুন-অর-রশীদের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা মিলেছে। এ মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদীয়া টাকশালে তৈরি।২০ আব্বাসীয় খলিফার আর একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে ময়নামতীতে। ওটির কোনো বর্ণনা আজো প্রকাশিত হয়নি। আরব বণিকেরা চট্টগ্রাম হয়েই বঙ্গের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করত, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। কাজেই অষ্টম শতকেও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

৭৮৮-১০১৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি আরাকানের বেসালি নগরে এক চন্দ্রবংশ রাজত্ব করেছেন। এ বংশের আদিপুরুষ মহাসিংহচন্দ্র (৭৮৮৮-৮১০) আর এর বংশধর চূড়সিংহ চন্দ্র (Chula Taing Chandra ৯৫১-৫৭) চট্টগ্রাম জয় করেন বলে কথিত। পাটিকেরও বেসালির চন্দ্ররা জ্ঞাতি হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে ধান্যবতীতে এদের পূর্বে রাজত্ব করতেন চন্দ্রসূর্য বংশীয়রা (১৪৬ ৭৮৮)। এঁরা যে ভারতিক ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাবিত অথবা ভারত থেকে আগত তাতে

সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত লিপি, শিব লাঞ্ছন ও ভারতীয় হরফ তার প্রমাণ। বিশেষত আরাকানের চন্দ্র রাজাদের মুদ্রা মিলেছে ময়নামতীতে। আটশতকের বাঙলায় প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় ম্রোহঙ-এর সিথাও প্যাগোডার স্তম্ভে উত্কীর্ণ রাজা আনন্দচন্দ্রের লিপি থেকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি পূর্বতন রাজাদের প্রশস্তিমূলক রচনা। এতে ৬৫টি শ্লোক আছে। ত্রিপুররাজ ছেঙথুমও একবার চট্টগ্রাম জয় করেন।

নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলের বৌদ্ধরাজা কান্তিদেবের একটি তাম্রশাসনের অসম্পূর্ণ খসড়া চট্টগ্রামের এক মন্দিরে পাওয়া গেছে।২৩ কান্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর। হরিখেল হুগলী থেকে যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপী ছিল বলে অনুমিত হয়।

সপ্তমশতকে হিউএনৎসাঙের পর্যটনকালে সমতট রাজ্য উত্তরে পুরোনো নিম্নব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পদ্মানদী অবধি বিস্তৃত ছিল। কুমিল্লা জেলার লোকশ্রুতি অনুসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে লালমাই পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সমুদ্র ছিল। যুগীদিয়া ও ভুলুয়া ছিল দ্বীপ। ফেনী অঞ্চল ছাড়া নোয়াখালির অন্যান্য অংশ ছিল সমুদ্রগর্ভে। সমুদ্রে চর জাগার পর তিতাস নদীরূপে দেখা দেয়, ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা কুমিল্লার দিকে প্রবাহিত ছিল। এ নদী ধ্রুম (ভলুয়া) নামে পরিচিত ছিল। গতিহারা ধ্রুম বা ভলুয়া নদীর চিহ্ন এখনো বর্তমান। চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু শেঙ চির পরিভ্রমণকালে সমতটের রাজা ছিলেন রাজভট্ট।

কানিংহামের মতে সমতট গঙ্গার বদ্বীপ যশোর অঞ্চল, Fergusson ও Watters-এর মতে যথাক্রমে ঢাকা ও ফরিদপুর। কিন্তু হিউএনৎসাঙ-এর বর্ণনা অনুসারে চটগ্রামও সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা: এবং সাত শতকে সম্ভবত উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পুরাতন গঙ্গা বা পদ্মা (তথা আধুনিক মধুমতী নদী) বেষ্টিত ছিল এই সমতটরাজ্য

কোনো কোনো বিদ্বানের মতে নয়শতকে এবং কারো কারো মতে সাত শতকের শেষে ও আটশতকের শুরুতে খড়গরা সমতটে রাজত্ব করতেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে সম্ভবত খড়গরাই সমতটে শাসক ছিলেন। I-Tsing–এর বর্ণনা মতে সাত শতকের শেষার্ধে ছাপ্পান্ন জন ভিক্ষুর ভারত ভ্রমণকালে শেঙচি সমতটে রাজভট্টকে রাজা দেখেছিলেন। অতএব, সাতশতকেই খড়গরা রাজত্ব করতেন।

খড়গ সাধারণ কুলবাগী নয়। প্রথম বৌদ্ধ রাজা নৃপাধিরাজ খড়গোদ্যমের সন্ততি হিসেবেই পিতৃনামাংশ গ্রহণ করেছেন পরবর্তী দুজন রাজা–জাতখড়গ ও দেখড়গ। দেখড়গের পুত্রের নাম রাজভট্ট। এঁদের পরিচয় পাওয়া গেছে ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তরপূর্বস্থিত আশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ও কুমিল্লা থেকে এগারো মাইল দূরে দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত সর্বাণীমূর্তিলিপি থেকে।২৮ খড়গরাজাদের রাজধানী ছিল কর্মন্ত বাসক। এইটি বিদ্বানদের মতে কুমিল্লা জিলার বড়কমতা। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী নিজে এ অঞ্চল পরিদর্শন করে এই মতই পোষণ করতেন।২৯

খড়গদের পরেই সমতটে চন্দ্রবংশীয়রা রাজত্ব করেন। এঁদের রাজধানী ছিল প্রথমে পাটিকের ও পরে বিক্রমপুর। দশ ও এগারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি সমতটে চন্দ্ররাজারা রাজত্ব করেন। চন্দ্র রাজারা আরাকানী রাজাদের জ্ঞাতি হলে, এসময় চট্টগ্রাম চন্দ্ররাজাদের অধিকারে ছিল বলে অনুমান করা সম্ভব। বিশেষ করে লামা তারানাথ বলেছেন গোপচন্দ্র চট্টগ্রামেই (জ্বালনধারায়) রাজত্ব করতেন এবং সাতশতকেও হিউএনৎসাঙ চট্টগ্রামকে সমতট রাজ্যভুক্ত দেখেছেন। চন্দ্ররাজাদের প্রথম রাজা পূর্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি (লালমাই, কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত)। তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও লালমাইতে রাজত্ব করতেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্য চন্দ্র (আনু. ৯০০-৯২৯ খ্রী.) শক্তিমান হয়ে চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করেন। এ সময় থেকে সমতটের চন্দ্ররাজারা বঙ্গেরও এক অংশের শাসক হলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তিনি প্রাগজ্যোতিষপুররাজকে পরাজিত করেন আর গৌড়রাজ গোপালকে সিংহাসনে পুনর্বহাল করেছিলেন। রাজ্যসীমা বিস্তৃত হওয়ায় তিনি বিক্রমপুরকে রাজধানী করে রাজত্ব করতে থাকেন (আনু ৯২৯-৯৭৫ খ্রী.) তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র (৯৭৫-১০০০) তাঁর পুত্র লড়হচন্দ্র (১০০০-১০২০) এবং তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (১০২০-১০৫০) রাজত্ব করেন। তিরুমালাই শিলালিপির প্রমাণে রাজা রাজেন্দ্রচোল ১০২১-২৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। মদনপুর, ঢাকা, ভাড়েলা ও পাইকপাড়ায় প্রাপ্ত যথাক্রমে শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের তাম্র ও মূর্তিলিপির আলোকে তিরুমালাইর শিলালিপি ভিত্তি করে চন্দ্ররাজাদের প্রায় নিশ্চিত আনুমানিক রাজত্বকাল নির্ণিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের পরে সমতট পালরাজ্যভুক্ত হয় এবং মহীপাল (১০৮০-৮৪) বাঘাউরা শিলালিপির প্রমাণে সমতটেরও অধিপতি ছিলেন। সম্ভবত সমতটে পাল অধিকার স্বল্পস্থায়ী ছিল।

চন্দ্রদের পরে বর্মণরাই সমতটের শাসনভার প্রাপ্ত হন।৩১ এরা রাঢ় অঞ্চলের সিংগুর বা সিংজোর (সিংহপুর) নগরে রাজত্ব করতেন বলেই কোনো কোনো পণ্ডিতের মত। ডি সি গাঙ্গুলীর মতে সিংহপুরা পূর্ববঙ্গের কোথাও অবস্থিত এবং এটি বর্মণ রাজাদের শাসনকেন্দ্র ছিল।

ভোজবর্মণের বেলাব (Belava) তাম্র শাসনের আলোকে অনুমান করা চলে যে বজবর্মণের পুত্র জাতবর্মণ এই রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা।৩৩ তৃতীয় বিগ্রহপাল ও জাতবর্মণ কর্ণের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। কাজেই বিগ্রহপাল ও জাতবর্মণ সমসাময়িক। জাতবর্মণ এগারো শতকের তৃতীয় পাদে রাজত্ব করতেন। জাতবর্মণের পরে তার ছেলে হরিবর্মণ এবং পৌত্র ভোজবর্মণ এবং তার পরে জাতবর্মণের অপর পুত্র সামল বর্মণ রাজা হন। এরপর সমতট সম্ভবত সেন-অধিকারভুক্ত হয়। সেনেরা ও বর্মণেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। পালেরা ও চন্দ্ররা ছিলেন বৌদ্ধ। এক রণবঙ্কমলহরিখেলদেবও (১২০৪-২০) সমতটে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তার এক তাম্রশাসন মিলেছে। এবং পাটিকের বৌদ্ধবিহারে ভূমিদানই এর বিষয়।৩৪

বর্মণদের পরে সমতটে দেববংশীয়রাই সম্ভবত রাজত্ব করেন। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মধুমথনদেবই প্রথম রাজা। তাঁর পুত্র বাসুদেব ও তাঁর পুত্র দামোদরদেব ও তাঁর পুত্র (?) দশরথদেব।

এ বংশের দামোদর দেবের (সিংহাসন আরোহণ ১২৩৯ খ্র.) তাম্রশাসন মেহের (১২৪৩) ও চট্টগ্রামে (১২৪৩) মিলেছে। দশরথদেবের তাম্রশাসন মিলেছে আদাবাড়িতে। দশরথ বিক্রমপুর থেকে তার তাম্রশাসন প্রদান করেছেন, তাতে মনে হয় কেশব সেনাদি সেন-সামন্তদের রাজ্যও তিনি অধিকার করেছিলেন। দামোদর দেব অন্তত ১২৪৩ সন অবধি রাজত্ব করেন।৩৫ মিনহাজ বলেছেন লক্ষ্মণ সেনের বংশধররা ১২৪৫ কিংবা ১২৬০ সন অবধি রাজত্ব করেন। অতএব দশরথ দেব তার পরই বিক্রমপুর জয় করে থাকবেন।

মর্কো পোলো বলেছেন, ত্রয়োদশ শতকের শেষপাদে (১২৭১-৯৫) মিয়েন (Mien) ও বাঙলার সঙ্গে কুবলাই খার সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১০৪৪-৭৪ খ্রীস্টাব্দে পগারাজ অনরঠার রাজ্যের উত্তরপূর্ব সীমা ছিল পাট্টিকের। কাজেই চট্টগ্রাম তখন অনরঠার রাজ্যভুক্ত ছিল। এর বংশধর নরসিংহপতি (Narathihapatei) কুবলাই খানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে বাঙলার রাজাও তার সহায়ক ছিলেন। সম্ভবত বাঙলারাজ তথা সমতটরাজ তখন হয়তো নরসিংহপতির সামন্ত ছিলেন। কাজেই মার্কো পোলোর প্রত্যক্ষ জ্ঞানজ উক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

কুমিল্লার কাছে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রমাণে বলা যায় ত্রয়োদশ শতকেও পাটিকের রাজ্য বর্তমান ছিল।৩৬ পাটিকের রাজকন্যাও বর্মীরাজ অলংসিথুর বিয়ে ও সে-কন্যার নরথু কর্তৃক হত্যাকাহিনী বর্মা ও আরাকানে সামান্য ভিন্নভাবে প্রচলিত এবং সে-কাহিনী Burma Chronicle-এ ও সাহিত্যে বিস্তৃত।

.

ইতিহাসের ছায়া

কেউ কেউ মনে করেন, গঙ্গা আগে চট্টগ্রামের পাশে সন্দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত। Rennel-এর মানচিত্রেও এর আভাস আছে। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বলেন: (Ganges) Rising in the mountains towards the north, it passes through the province of Delhi and imperial Agra and Allahabad and Behar into the the province of Bengal, and near Qazirhattah in the Sarkar of Barbakabad it divides into two streams, one of these following east-wards falls into the sea of the port of Chittagong

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম পাদে গঙ্গামুখ বহির্বাণিজ্যের বন্দর ছিল বলে স্ট্রাবো (১৮২৪ খ্রী.) উল্লেখ করেছেন। গ্রীকরাও গঙ্গার মোহনাস্থিত বন্দরে বাণিজ্য করত। গঙ্গার নৌযানের নাম ছিল কলন্দিয়া (Calandia)। জলবাণিজ্য তত্ত্বের আদিগ্রন্থ Periplus of the Erythrean Sea–তে (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক) গঙ্গামুখস্থ বন্দরের কথা পাই : On the bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought Malabathrum and Gangetic spikenard and pearls and muslin of the finest sorts, which are called Gangetic, It is said that there are gold mines near these places and there is a gold coin which is called Caltis. And Just opposite this river there is an island in the ocean the last par of the inhabited world towards the east, under the rising sun itself, it is called Chryse and it has the best tortoise shell of all the places on the Erythrean Sea. এর সঙ্গে আলবেরুনীর গঙ্গাসাগরও (গঙ্গা পতিত হয়েছে যে সাগরে?) তুলনীয়।৩৮ এবং Bernonilli তার গ্রন্থে আরবি শাত (delta) ও গঙ্গা নদী থেকে গঙ্গার মোহনাস্থিত বদ্বীপ নির্দেশ করবার জন্যে আরবেরা শাতগাঙ (< সাতগাওঁ > কাওন) নাম দান করে বলে যে-মত প্রকাশ করছেন, তাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। ইবন বতুতার সাতকাওন (Sudkawan) সম্ভবত এই শাত+ গাঙ–এরই বিকৃতরূপ। ইবন বতুতা বলেছেন : The First city in Bengal (লখনৌতি তথা গৌড় নয়) that we entered, was Sudkawan, a large town on the coast of the great sea. Close by it the river Ganges, to which the Hindus go on pilgrimage, and the river Jun unite and discharge together into the sea- এ অংশের সঙ্গে Fakhruddin used to make expedition up the river against the land of Lakhnawti because of his naval superiority, but when the rainless season returned, Ali Shah would make raids by land on Bengal 47. I set out from sudkawan for the mountains of Kamru, a months journey 0715 after fifteen days sailing down the river (blue-river Meghna, from Kamru) as we have related, we reached the city sunarkawan on মিলিয়ে পাঠ করলে সন্দেহ থাকে না যে বতুতা (ক) বাঙলা অর্থে পূর্ববঙ্গ বুঝেছেন এবং (খ) তার Sudkawan চট্টগ্রামই। এখান থেকেই উজান বেয়ে কামরূপ এক মাসের পথ। সপ্তগ্রাম বাঙলার নয়, লখনৌতির অন্তর্গত। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল এবং পর্তুগীজ ঐতিহাসিক দ্যা ব্যারোজ বলেছেন, চট্টগ্রামের পাশেই গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। (গ) Jun (যমুনা) নামে এখানে ব্রহ্মপুত্র নদকেই নির্দেশ করা হয়েছে অতএব, বতুতার Sudkawan চাটগাঁও বলেই আমাদের বিশ্বাস। ভাগীরথী, যমুনা পদ্মা ও মেঘনাকে সাধারণভাবে গঙ্গা নামে অভিহিত করার রেওয়াজ বিদেশীদের মধ্যে সুপ্রাচীন। বিশেষ করে যুগদিয়া ও মুলুদিয়া যে দ্বীপ ছিল, তা এ দুটোর নাম ও এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি সূত্রেই প্রকাশ। এ তথ্য যদি মেনে নি, তাহলে গঙ্গামুখ যে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছেই ছিল তা মানতে দ্বিধা হবে না।

আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মান ইবন খোর্দাদবেহ (৯১২ অথবা ৮৪৪-৪৮) হুদুদুল আলমের অজ্ঞাত লেখক (৯৮২ খ্রী.) আলমাসুদী (৯৫৬ খ্রী.) এবং আল ইদ্রিসীর (১০৭৫-১১০০ খ্রী.) বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাঙলা দেশ।

সোলায়মানের রচনা বলে পরিচিত সিলসিলাত-অল-তওয়ারিখে (৮৫১ ৫১ খ্রী.) বাঙলা দেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমন্দর-এর উল্লেখ আছে ইবন খোর্দাদবেহর কিতাব অলমাসালিক ওয়াল মুমালিক–এ আল মাসুদীর গ্রন্থে আর হুদুদুল আলমে। ইবন খোর্দাদবেহ বলেন : সমন্দরে চাউল উৎপন্ন হয়, পনেরো-বিশ দিনের পথ কামরূপ ও অন্যান্য স্থান থেকে এখানে চন্দন (মুসববর বা ঘৃতকুমারী Aloe) আমদানি হয়।

আল ইদ্রিসীর মতে : Samandar is a large town, commercial and rich, where there are good profits to be made. It is a port dependent upon Kanauj, king of this country. It stands upon a river which comes from the country of Kashmir. Rice and various grains specially excellent wheat are to be obtained here. Aloe wood is brought hither from the country of Karmut (Kamrup), 15 days distance by a river of which the waters are sweet. The aloe-wood which comes from this country is of a superior quality and of a delicious perfume. It grows in the mountains of Karan.

One days sail from this city there is a large island well peopled and frequented by merchants of all countries. It is four days distance from the island of Sarandib. To the north, at sevendays distance from Samandar is the city of Kashmir.

এ বর্ণনা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও সমন্দর সম্বন্ধে খোর্দাদবেহ ও আল ইদ্রিসীর উক্তির অনেকাংশে মিল আছে। আল ইদ্রিসীর মতে (ক) সমর নদীতীরস্থ বাণিজ্যবন্দর; (খ) ধান ও গমাদি নানা শস্য ও বন্দরে পাওয়া যায়; (গ) পনেরো দিনের পথ কামরূপ থেকে নদীপথে এখানে চন্দন আমদানি হয় এবং (ঘ) সমন্দর থেকে একদিনের পথে একটি বড় দ্বীপ আছে, এ দ্বীপও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর। হুদুদুল আলমে রাজার নাম দহুম, আল ইদ্রিসীর মতে কনোজ। কিন্তু aloe সম্বন্ধে তিনজনই একমত।

সোলায়মানের সিলসিলাত অল তওয়ারিখে পাই : These three states (Jurz গুর্জররাজ,–Balhara রাষ্ট্রকুটরাজ বল্লভরাজ এবং Tafak) border on a Kingdom called Ruhmi which is at war with that of Jurz. The king is not held in very high estimation. He is at war with Balhara as he is with the King of Jurz or the King of Tafak. It is said that when he goes out to battle he is followed by about 50.000 elephants... There is a stuff made in his country which is not to be found elsewhere; so fine and delicate is this material that a dress made of it may be passed through a single ring (Muslin) is made of cotton and we have seen a piece of it. Trade is carried on by means of kauris which are the current money of the country. They have gold and silver in the country, aloes, and the stuff called samara, of which madabs are made the striped bushan or

karkaddam is found in this country. It is an animal which has a single horvein in the middle of its forehead and in this horn there is a figure like unto that of a man.

এই উক্তি থেকে পাচ্ছি : (ক) দেশের রাজার নাম রুমি, তিনি শক্তিমান ও যুদ্ধপ্রিয় রাজা। কেবল গজারোহী সৈন্যের সংখ্যাই তার অর্ধলক্ষ। (খ) এখানে সুচিক্কণ মসলিন পাওয়া যায়। মসলিন ভারতের অন্যত্রও পাওয়া যেত, কিন্তু সেগুলো অত সূক্ষ্ম ছিল না। (গ) এখানে কড়ির মুদ্রা চলে এবং aloe ও গণ্ডার পাওয়া যায়। হুদুদুল আলমের বর্ণনার সঙ্গে এ বর্ণনা কতেকাংশে মিলে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হুদুদুল আলমে আছে : (ক) দেশের রাজার নাম দহুম, তিনি শক্তিমান এবং তার ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। (খ) এদেশে ভালো সুতা, চন্দন, হাতী ও (সামুদ্রিক) শঙ্খ সুলভ।

আল মাসুদীও বলেন : The Kingdom of Rahma extends both along the sea and continent. It is bounded by an inland state called the kingdom of Kaman. The inhabitants are fair and have their ears pierced. They have elephants, camels and horses; both sexes are generally handsome. Beyond this kingdom is that of Rahma which is title for their kings and generally at the sametime their name. বিষয়ে আল ইদ্রিসী ইবন খোর্দাদবেহর উক্তি উদ্‌ধৃত করে বলেছেন : Kings generally bear hereditary titles;.... Among the kings of india, there are the Balhara Jaba Tafir, Hazr, Abat, Dumi (Rahmi?) and Kamrun. These names are taken only by the prince who reigns over the province or country no other has any right to assume them, but whoever reigns takes the name.

এখানে ধারণাটা সত্য হলেও নাম ও বাচীর পার্থক্য নির্ণয়ে ত্রুটি ঘটেছে। তা হোক, কিন্তু সম্ভবত রুহমি রুহম ও দুহম একই নামের বিকৃতি। এ বিষয়ে Hodivala–র অনুমান সমাধানের সহজ পন্থা নির্দেশ করে : It seems to me that Rahma which is said by Masudi to have been the title or name of the king as well as his kingdom, is to be explained by the fact that the kingdom was described in the original writing to which Sulaiman and Masudi were indebted for their knowledge as Mulk-I Duhma This phrase is equivocal and may mean The kingdom of Dharma and also the King of Dharma; the dal was subsequently supposed to be a re and the rea wav The phrase was thus misread as Mulk-I–Ruhm or Ruhmi kingdom of Ruhmi

এদেশের রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই সম্ভবত পূর্বসূরীর অনুসরণে আরব ভৌগোলিকরা গ্রন্থপরম্পরায় একই তথ্য পরিবেশন করেছেন। Jurz যদি গুর্জর হয় আর বলহার যদি রাষ্ট্রকুটরাজ বল্লভরায় হন, তাহলে পালরাজশ্রেষ্ঠ ধর্মপালই উক্ত দুহম বা রুহমি তথা : রহম। কেননা, ধর্মপালের (৭৭০-৮১০) সঙ্গে এঁদেরই যুদ্ধ হওয়ার কথা।

উপরে পরিবেশিত তথ্যগুলো থেকে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে-ধারণা পাই তা হচ্ছে এই :

ক. চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও ভোট-চীনা লোকের বসতিই আদিম।

খ, খ্রীস্টোত্তর যুগে বিহার অঞ্চলের আর্য-সংস্কৃতিপুষ্ট লোকেরা এ এলাকায় উপনিবিষ্ট হয় এবং সে সূত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এখানে প্রচার লাভ করে। আর তা পর্বতের বাধা অতিক্রম করে পর্গা ও পেগু (হংসবতী) অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

গ, খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের দিকে চট্টগ্রামে-আরাকানে বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এ শতকেই সম্ভবত কোনো চন্দ্রবংশীয় রাজা মহামুনি বুদ্ধপ্রতিমা নির্মাণ করান।

ঘ, এ অঞ্চল অন্তত ষষ্ঠশতক অবধি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সমতটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

ঙ. চট্টগ্রাম প্রাচীনকালে সীতাকুণ্ড ও বাড়ব পর্বতনিঃসৃত তপ্তজল ধারাসমন্বিত অঞ্চল– উত্তর-পূর্ব ভারতে জ্বালন ধারা নামে পরিচিত ছিল। এই জ্বালনধারাই কালক্রমে জ্বালন্ধর নামে খ্যাত হয়। তাই সম্ভবত প্রথম যুগের আরব বণিকদের মুখে সামন্দর হয়ে ওঠে।

চ. ধর্মপালের আমলে চট্টগ্রাম হয়তো স্বল্পকালের জন্য পালশাসনভুক্ত হয়।

ছ, উত্তরকালীন চাটিগাও নামের উৎপত্তির অনেকগুলো অনুমিত উৎসের মধ্যে চিত্ত গঙ্গ ও শাৎ-ই গাঙ–এ দুটো বেশি নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসহ।

জ, সুপ্রাচীনকাল থেকেই সিন্ধু এবং গঙ্গা–এ দুটোই সুপরিচিত প্রধান নদী। অন্যগুলো এ দুটোর শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিগণিত। ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গার উল্লেখই বেশি পাই বিদেশীর রচনায়। এজন্যে আমরা দেশী লোকেরা নদী নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হই। চট্টগ্রামের পাশেই গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে পড়ত। এ উক্তি থেকে তিনটে ধারণা করা সম্ভব। এক. সেকালের গঙ্গা বর্তমানে গতি পরিবর্তন করেছে। দুই. মেঘনা বা পদ্মকে গঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিন. মেঘনা বা পদ্মও গতিপরিবর্তন করে চট্টগ্রাম থেকে দূরে সরে এসেছে।

ঝ. খ্রীস্টোত্তর দশম-দ্বাদশ শতকে চট্টগ্রাম সমতটের সঙ্গে প্রশাসনিক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়। অবশ্য সাময়িক বিযুক্তি যে ঘটেনি তা নয়। আর এর আগে তিনদিকে পর্বত ও একদিকে সাগর-বেষ্টিত আরাকান ও চট্টগ্রাম একটি একক অঞ্চল ছিল বলে অনুমান করা চলে।

.

আমরা দেখেছি, পর্বত ও সাগরবেষ্টিত চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন ভূখণ্ড। এর সঙ্গে আরাকানের সম্পর্কও সুপ্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে আরাকান ও চট্টগ্রাম একই ভূখণ্ড। মধ্যে কেবল পর্বতমালার ব্যবধান। এই দুরতিক্রম্য বাধাই উভয় অঞ্চলে অভিন্ন গোত্রীয় জনবসতির অন্তরায় ছিল। তাই চট্টগ্রামে অস্ট্রিকাদি জনগোষ্ঠীর বসতি অধিক। আর আরাকানে দেখছি, ভেট চীনা গোত্রীয় কিরাত-জাতীয় লোকের আধিক্য। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতবেষ্টিত বলেই আরাকান ব্রহ্মদেশ থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে আরাকানের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছিল অনেক কাল।

তবু আরাকান অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠীর এবং আভিজাত্যকামী জনগণের মাগধী-ঐতিহ্যপ্রীতি ধর্মসূত্রে উত্তরভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব স্বীকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রায় দু হাজার বছর আগে হিন্দু-বৌদ্ধ জনসমষ্টি তাদের ভাষা, লিপি, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে এ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানীয় জনগণকে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করে।

যদিও সমগোত্রীয় বলে চট্টগ্রামবাসীরা ধর্মে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে উত্তরভারতীয় জাতীয়তা স্বীকার করে নিল, তবু রাষ্ট্রীয় অভিন্নতা সাধন সম্ভব হয়নি অনেককাল। এর মুখ্য কারণ সম্ভবত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা।

এখনকার বাঙলাদেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যই প্রাচীনতম, রাঢ় অঞ্চলও প্রাচীন। কিন্তু সেখানকার জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন নয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি– ব্যাধ গোহিংসক জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়। এবং জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থেও রাঢ়বাসীর নিন্দা রয়েছে।

এই উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগ বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। কেননা সমতট (Plain coastal land) অঞ্চল সম্ভবত সাগরগর্ভ থেকে গড়ে ওঠে অনেক পরে। হুএনৎসাঙ কিংবা ইৎসিঙের বর্ণনাসূত্রে জানতে পাই যে সমতট অঞ্চলে দিগন্তবিসারী হাওড় বা জলাভূমি ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে (১৮-২৪ খ্রী.) পর্যটক স্ট্রাবোও লোনা জলের। উপদ্রব দেখেছিলেন। কাজেই এ অঞ্চল জনবিরল থাকাই সম্ভব।

উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই হয়তো চট্টগ্রাম মৌর্য, গুপ্ত কিংবা পাল শাসনভুক্ত হয়নি। এ সুযোগে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে চট্টগ্রাম-সংলগ্ন . আরাকানের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি চট্টগ্রামে স্বাধিকার বিস্তার করে। এ অধিকার পরে সমতট অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপিতে, ময়নামতীর চন্দ্ররাজাদের ঐতিহ্যে, পগারাজ অনরঠার আরাকান-পাটিকের-এ আধিপত্য লাভের ইতিকথায় কুবলাই খার বাহিনীর সঙ্গে Mien ও বাঙালি সৈন্যের যুদ্ধের উল্লেখে, পাট্টিকের রাজকন্যার সাথে পগারাজ অলংসিথুর বিয়ের বর্ণনায় এবং পাটিকের রাজপুত্রের পগারাজকন্যার পাণি প্রার্থনার কাহিনীতে আমাদের অনুমানের সমর্থন মেলে।

আরাকানী রাজ-ইতিবৃত্ত রাজোয়াঙে (রাজবংশ) চট্টগ্রামের ইতিহাসের কিছু উপাদান রয়েছে। এজন্যে আরাকানী ইতিবৃত্তের আলোচনা প্রয়োজন। রাজোয়াঙ সূত্রে জানা যায় এক চন্দ্রসূর্য আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ধন্যবতীতে রাজত্ব করতেন। তার বংশধরেরা সূর্যাধিপতি–সূর্যপ্রতিপদ-সূর্যরূপ-সূর্যমণ্ডল-সূর্যবর্ণ সূর্যউষ্ণ-সূর্যনাথ-সুর্যবন্ত–সূর্যবন্ধু-সূর্য কল্যাণ–সূর্যমুখ্য-সূর্যতেজ-সূর্যপুণ্য-সুর্যকলা-সূর্যপ্রভা সূর্যসিক্ত-সূর্যতীর্থ–সূর্যবিমল-সূর্যসেন-সূর্যগ্রন্থ–সূর্যস্বর্গ–সূয়শী সূর্যক্ষিতি-সূর্যকূট-সূর্যকেতু নাম নিয়ে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তারপর বৈশালীতে (Wesali) ৭৮৮ থেকে মহাসিংহ চন্দ্র-সূর্য সিংহচন্দ্র-মৌলসিংহচন্দ্র, পুরসিংহচন্দ্র কালসিংহচন্দ্র, বসিংহচন্দ্র, শ্রীসিংহচন্দ্র, তীক্ষ্ণসিংহচন্দ্র, চূড়সিংহচন্দ্র প্রভৃতি ৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করার পর মিউগোত্র প্রধান অম্যহতু সিংহাসন দখল করেন। তার পুত্র মেপিউ (Yepyu) থেকে চূড়সিংহের সন্তান সিংহাসন ছিনিয়ে নেন। চুড়সিংহের ভ্রাতুস্পুত্রের সন্তান Hkittathin, Pyinsa- কেই রাজধানী করেন। এখানে ১০১ থেকে ১১০৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি এ বংশের রাজধানী থাকে। তারপর এ বংশেরই রাজা Letyminnau ১১০৩ কিংবা ১১১৮ সনে Parin কে রাজধানী করেন। এখান থেকে। ১১৬৭ সনে এই বংশের Minousa, Hkrit শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। এ বংশের Misuthin Pyinsa–কে আবার রাজধানী করেন ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৩৭ সনে Laungyet-এ রাজধানী হয় এবং ১৪৩৩ সন থেকে ১৭৮৫ সনে বর্মী বিজয় অবধি Mrohaung বা Mrauku ই শাসনকেন্দ্র ছিল। তালিকা অনুসারে দেখা যায় চন্দ্রসূর্যের বংশধরেরাই প্রায় ১৬৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে তারা সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুতও হয়েছেন। এই তালিকার সঙ্গে আনন্দচন্দ্র প্রদত্ত তালিকার মিল নেই। আনন্দচন্দ্রের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রাপ্ত পূর্ব রাজাদের অস্তিত্বেও সন্দেহ করা যায় না। কেননা, এর মধ্যকার কোনো কোনো নামের মুদ্রা মিলেছে। তাহলে আমাদের অনুমান করতে হবে, কোনো এক বংশ গোটা আরাকান অঞ্চলে উপর (Yoma পর্বতসীমা অবধি) সব সময় রাজত্ব করেনি। কেন্দ্রীয় শাসন-শৈথিল্যের সময় বিভিন্ন সামন্ত স্বাধীনভাবে বংশপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন। রাজধানী পরিবর্তনের কারণ হয়তো এ-ই। সম্ভবত ধান্যবতী ও বৈশালী বা অন্যত্র একই সময়ে অর্থাৎ ৩৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে চন্দ্রবংশীয় দুটো শাখা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এবং ৭৮৮ সনে হয় ধান্যবতী শাসকেরা (Phayre ও Harvey-র তালিকা অনুসারে) বৈশালী রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পূর্ববর্তী রাজাদের মতো চন্দ্র বাচী গ্রহণ করেন, অথবা এ সময়ে বৈশালীর চন্দ্ররা ধান্যবতী রাজ্য জয় করে গোটা অঞ্চলের অধিপতি হন।

প্রথমোক্ত অনুমান সত্য হলে, আর একটি অনুমানও যোগ করতে হবে, তা এই Doen চন্দ্রের রাজ্যসীমা সমতট অবধি বিস্তৃত ছিল। বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের পতনের পর পরপুর নামক উপকূল অঞ্চলের সামন্ত (?) রাজা মহাবীর আরাকানের একাংশে রাজত্ব করেন। সে অঞ্চলের রাজপরম্পরার নামই আনন্দের স্তম্ভলিপিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এরপরে ব্রয়জপ (Vrayajap) ও Seoinreni–উভয়েই বারো বছর করে ২৪ বছর রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন ধর্মশূর। তারপর বজ্রশক্তি-ধর্মবিজয়-নরেন্দ্রবিজয়-ধর্মচন্দ্র অথবা নরেন্দ্র চন্দ্র (বজ্রশক্তির অপর পুত্র) আনন্দচন্দ্র।

চন্দ্রদের রাজধানীর উল্লেখ আনন্দচন্দ্রের উৎকীর্ণ স্তম্ভলিপিতে নেই। এই স্তম্ভ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাও জানা নেই। স্থানান্তরিত হয়ে ম্রোহঙের Shitthaung প্যাগোডায় রক্ষিত আছে। কাজেই বৈশালীই আনন্দ-চন্দ্রদের রাজধানী ছিল, তেমন কথাও বলা চলে না। তবে ম্রোহঙ-এ বা তার সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে আনন্দ চন্দ্ররা যে রাজত্ব করতেন, তা মোহঙ-এ রক্ষিত আলোচ্য স্তম্ভলিপি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। যা হোক, সমতটের সঙ্গে যে এর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক যোগ ছিল তা উভয় অঞ্চলে চুণ্ডাদেবীর প্রতিষ্ঠা, মহাযান সর্বাস্তি মতের প্রাবল্য, Naulakka, Domgaha, Dankangamarganga, Duvara Bhuro kanaulakkalvaraka প্রভৃতি বঙ্গের অনার্য স্থান-নাম এবং সমতট অঞ্চলে (ময়নামতীতে) আরাকানী চন্দ্ররাজাদের মুদ্রা প্রাপ্তি প্রভৃতি তার প্রমাণ।

E. H. Johnston–এর বিবৃত পাঠের অনুসরণে আমরা আনন্দের স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ রাজ পরম্পরার নামের তালিকা পেশ করছি :

১। ক্রমিক সংখ্যা ———— রাজা ———— রাজত্বকাল

১ ——— ——— ১২০
২ ——— ——— ১২০
৩ ——— ——— ১২০
৪ ——— বহুবলি ——— ১২০
৫ ——— রঘুপতি ——— ১২০
৬ ——— ——— ১২০
৭ ——— চন্দ্রোদয় ——— ২৭
৮ ——— অন্নবেত ——— ৫
৯ ——— ——— ৭৭
১০ ——— রিম্ভ্যপ্প ——— ২৩
১১ ——— রানী কুবেরামী বা কুবেরা ——— ৭
১২ ——— তারস্বামী উমাবীর্য ——— ২০
১৩ ——— যজ্ঞ (Jugna) ——— ৭
১৪ ———- লাঙ্কী (Lanki) ————- ২

এঁরা ১০১৬ কিংবা ১০৬০ বছর ব্যাপী রাজত্ব করেন।

.

২। চন্দ্রবংশীয় রাজা : এ বংশের উদ্ভবকাল আনু. ৩৩০-৬০ খ্রীস্টাব্দ, পতনকাল আনু. ৫৬০-৯০ খ্রীস্টাব্দ।

ক্রমিক সংখ্যা– রাজা —রাজত্বকাল ——মন্তব্য

১–(Doen) দ্বেনচন্দ্র — ৫৫– ১০১ জন রাজা পরাভূত করেন

২– রাজচন্দ্র —- ২০

৩– কালচন্দ্র – ৯ — একটি প্রাপ্ত মুদ্রা কালচন্দ্রের বলে অনুমিত। (Johnston p.384) এ নামটি এবং ৯ বছর শাসনকাল বৈশালীর কালচন্দ্রের সঙ্গে মিলে যায়।

৪– দেকচন্দ্র – ২২ — এর মুদ্রা মিলেছে।

৫–যজ্ঞচন্দ্র – ৭–

৬ — চন্দ্রবন্ধু – ৬ — কেউ কেউ নামের তাৎপর্যে গুরুত্ব দিয়ে এঁকে ভিন্নবংশীয় বলে (জবর দখলকার?) অনুমান করেন।

৭—ভূমিচন্দ্র—৭–

৮–ভূতিচন্দ্র—২৪–

৯–নীতিচন্দ্র—৫৫–এঁর বড় ছোট অনেক মুদ্রা মিলেছে।

১০–বীর্যচন্দ্র বা বীরচন্দ্র—৩— মুদ্রায় 'বীর' নাম উৎকীর্ণ।

১১—প্রীতিচন্দ্র—১২– মুদ্রা মিলেছে।

১২—পৃথিবীচন্দ্র—৭– মুদ্রা মিলেছে।

১৩—ধৃতিচন্দ্র—৩– মুদ্রা মিলেছে।

এঁরা আনু . ৫৬০ বা ৫৯০ অবধি ২৩০ বছর রাজত্ব করেন।

.

৩। পরবর্তী শাসকগণ :

১–মহাবীর–১২

২–ব্রযজপ (Vrajayap)–১২

৩–Sevinirin (Mavukaghatin)–১২

৪–ধর্মশূর—১৩

.

৪। ধর্মশূরের পরবর্তী শাসকবংশ :

১–বজ্রশক্তি—১২–দেবাউজ বা শ্রীধর্মবাজাওজ তথা আদিনাথের বংশজ।

২—ধর্মবিজয়—৩৬–বিজ্ঞানবাদী বা সর্বাস্তিবাদী মহাযান পন্থী, এর মুদ্রা মিলেছে।

৩–নরেন্দ্র বিজয়–২ মাস

৪–শ্রীধর্মচন্দ্র বা বীরনরেন্দ্রচন্দ্র (বজ্রশক্তির অপর সন্তান)—১৬– এঁর মুদ্রা মিলেছে।

৫–আনন্দচন্দ্র ইনি সিংহলের শিলামেঘ বর্ণ রাজার ও দাক্ষিণাত্যের শীতাম্রপত্তনের রাজা শৈব-অন্দের কন্যা Dhanda কে বিয়ে করেছিলেন—৯–এঁর রাজত্বের নবম বছরে আলোচ্য স্তম্ভলিপি উত্তীর্ণ হয়। আনন্দচন্দ্র আনন্দোদয় আনন্দ মাধব, আনন্দেশ্বর নামের বহু মঠ মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠাতা; সিংহলের ভিক্ষুদেরকেও দানে তুষ্ট করেন।

আনন্দচন্দ্ররা আনু. ৬৮৫ কিংবা ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১২৫ বছরকাল রাজত্ব করেন। পরবর্তী দুজন রাজার নাম (আনু. দশ শতকের) সিংহ গণপতিশূর চন্দ্র এবং সিংহ বিক্রমশূর চন্দ্র।

উপরে আলোচিত তথ্য থেকে আমরা কয়েকটি ধারণা গঠন করতে পারি :

ক. ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত উত্তরভারতীয় লোকেরা আরাকানে উপনিবিষ্ট হয়। এদেরই ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত আদি রাজার নাম চন্দ্রসূর্য। ধন্যবতী (Dinnyapati > ধন্যবতী Johnston প্রদত্ত নাম)। এঁর ও এর বংশীয়গণের আটশতক অবধি রাজধানী ছিল।

খ. সম্ভবত খ্রীস্টিয় চতুর্থশতক থেকে এদের জ্ঞাতিবংশীয় বা অপর চন্দ্র বংশীয় সামন্ত Doern (Devendra বা Doija Singh) চন্দ্র বৈশালীতে বা ম্রোহঙ-এ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ২৩০ বছর যাবৎ এ বংশীয়রা রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের রাজ্যসীমা সম্ভবত সমতট অবধি বিস্তৃত ছিল।

গ. দেশীয় শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে ধান্যবতীর রাজারা ৭৮৮ সনে বৈশালীতে রাজধানী করেন। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না হয়তো যে ধান্যবতীর রাজা বৈশালী রাজ্য দখল করে এখানেই রাজধানী করলেন এবং পূর্ববর্তী স্থানীয় রাজাদের অনুকরণে চন্দ্র বাচীও নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন। সম্ভবত ধান্যবতীর রাজা গোটা চন্দ্র রাজ্য জয় করতে পারেননি। তার উত্তরাংশে ম্লোহ অঞ্চলে চন্দ্রদের পরপুরাস্থ সামন্ত রাজা মহাবীর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। অথবা পরপুরা তাঁর নবার্জিত রাজ্যেরও শাসনকেন্দ্র হয়।

ঘ. পালি-সাহিত্যের নিদ্দেস-উক্ত পুরেঙ্গুর> পরপুর> পুরপুর, Ptolemy র বরকুর ইবন বক্তৃতার বরকান, কুতুবদিয়া ও আকিয়াবের মধ্যস্থিত কোনো বন্দর। কাজেই পরপুর, বৈশালী, Hkrit, পিনসা, পেরিন ও ম্রোহঙ-এর নিকটবর্তী হওয়ারই কথা।

ঙ. মহাবীর বা তার পরবর্তী রাজা বজ্রশক্তি বংশীয়দের রাজধানী কোথায় ছিল, তা স্তম্ভলিপি থেকে কিংবা মুদ্রা থেকে জানা যায় নি। বৈশালী ছাড়া উক্ত চারস্থানের যে-কোনো একটা অথবা পরপুরা এদের রাজধানী ছিল বলে মনে হয়।

চ. বজ্রবিক্রমের পরবর্তী রাজারা চট্টগ্রামের তথা সমতটে কতেকাংশ স্বাধিকারে এনে ছিলেন মনে হয়। দশম শতকে আরাকানে যখন এদের শাসনাধিকার লুপ্ত হয়, তখনো চট্টগ্রাম অঞ্চল এ বংশীয়গণের করতলে ছিল সম্ভবত। বৈশালীর রাজা চূড়সিংহচন্দ্র (Chulataing Chandra) হয়তো এমনি কোনো শূরচন্দ্র রাজা থেকে চট্টগ্রামের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আরাকানী ইতিহাসে ইনিই হয়তো গুরতান (শূরচান> শূরচান্দ), যাকে আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থে (আরব) সুলতান (পৃ. ২-৩) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেউ কেউ থুরতন নামটি রাজ্যজ্ঞাপক বলে মনে করেন, তারা থুরতন অর্থে ত্রিপুরা রাজ্য বুঝেছেন।

ছ, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে, সংস্কৃতের ব্যবহারে, নাগরী হরফের প্রয়োগে, চুণ্ডাদেবীর প্রতিষ্ঠায় ও মহাযানমতের প্রাবল্যে সমতট ও আরাকানে কোনো পার্থক্য ছিল না। বৃষ শঙখ ও লাঞ্ছনাও তাদের অভিন্ন ছিল।

জ, তাই মনে হয়, সমতটের চন্দ্ররা সম্ভবত আরাকানের চন্দ্রদেরই জ্ঞাতি ছিল। ওখানে চন্দ্রদের অধিকার লুপ্ত হওয়ার পরেও এঁরা এখানে এগারো শতকের প্রথমপাদ অবধি টিকে ছিলেন। সময়ের দিক দিয়েও প্রায় মিলে যায়। এ বংশের প্রথম রাজা বলে অভিহিত পূর্ণচন্দ্র সম্ভবত প্রথম রাজা নন; পূর্ণচন্দ্র-সুবর্ণচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র গড়ে ৪৪/৪৫ বছর ধরে রাজত্ব করতে থাকলে ৭৮৮ খ্রস্টাব্দ থেকে এরা সমতটে কখনো সামন্ত, কখনো বা স্বাধীন রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছেন বলে অনুমান করবার যুক্তি আছে।

ঝ. লামা তারানাথও (জন্ম ১৫৭৩, গ্রন্থ সমাপ্তি ১৬০৮ খ্রী:) এক চন্দ্রবংশের উল্লেখ করেছেন : বৃক্ষচন্দ্র, বিগমচন্দ্র, কামচন্দ্র (হর্ষবর্ধনের সময়ে বঙ্গরাজা ছিলেন) সিংহচন্দ্রের (হর্ষপুত্র শীলের কালে) প্রপৌত্র, বালচন্দ্রের পৌত্র বিমলচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন। তিনি ছগল বলে এক রাজার নামও বলেছেন। আবার ববলা সুন্দর ও তার পুত্র চন্দ্রবাহন আদির নাম করেছেন। এতগুলো নাম নিছক কল্পনাপ্রসূত না হওয়ারই কথা, মনে হয় এরা চট্টগ্রামে সাধারণ বা সামন্ত শাসক ছিলেন। উপরোক্ত চন্দ্ররা আরাকানের অথবা সমতটের চন্দ্রদের প্রতিনিধি হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষ করে আনন্দ চন্দ্রের স্তম্ভলিপির প্রথম নাম হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতে বালচন্দ্র। ৪৫ এর পাঠোদ্ধার Johnston করেননি।

.

০৮.

১। সমতট

এলাহাবাদে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতেই প্রথম সমতটের উল্লেখ পাই। একে গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক সীমান্তে করদরাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় সমতট ও বঙ্গকে পৃথক অঞ্চল বলে নির্দেশ করা হয়েছে৪৬ Ctunningham–এর মতে সমতট গঙ্গার বদ্বীপ যশোর, Ferguson ও Watters–এর মতে ফরিদপুর ও ঢাকা।

সাত শতকে হিউএনৎসাঙ সমতট রাজ্যকে কামরূপের দক্ষিণস্থ নিম্ন ও আর্দ্রভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর মতে রাজ্যের আয়তন ৩০.০০০ লি (প্রায় ৭০০ মাইল) এবং রাজধানীর আয়তন ২০ লি (প্রায় ৪ ২/৩ মাইল)। ইৎসিঙ তার পর্যটনকালে রাজভট্টকে সমতটের রাজা দেখেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে আঁশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয় এঁরই পিতা দেব খড়গের। কুমিল্লায় প্রাপ্ত সর্বাণীমূর্তি লিপিতে এঁর পূর্ব রাজাদের নাম আছে। সমতটের আদি রাজধানী ছিল কারমান্তা, এটি কুমিল্লা জেলার আধুনিক (বর) কামতা গ্রামে ছিল। এখানে রাজধানীসুলভ নিদর্শনাদি এখনো বর্তমান। এক পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত লোকনাথের আলেখ্য পরিচিতিতে চাম্পিতলাকে (কুমিল্লা জিলায়) সমতটের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে সমতটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকজন স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করেন। কোটালিপাড়ার পাঁচখানি ও বর্ধমানের একখানি তাম্রলিপি ও মুদ্রা থেকে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এঁরা ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করতেন। হিউএন সাঙ যখন সমতট পর্যটন করেন, তখন তিনি সেখানে ত্রিশটি সঙঘারাম ও দুহাজার ভিক্ষু দেখেছিলেন। এবং জৈনাদি সর্বধর্মের লোকের বাস ছিল ও শতেক মন্দির শোভা পেত। হিউএন সাঙের শিক্ষক নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটের রাজকুমার ছিলেন। ইসিঙ (৬৭৩-৮৭) বলেছেন সমতটরাজ বৌদ্ধ ছিলেন, তার নাম রাজভট্ট। এই রাজভট্ট খড়গ-বংশীয় রাজা দেবখঙ্গের পুত্র। দেবখঙ্গ জাতখঙ্গের আর জাতখঙ্গ খদ্মেমের পুত্র। রাজভট্ট যদি সপ্তম শতকের শেষপাদে রাজত্ব করে থাকেন তাহলে খঙ্গোদ্যম ষষ্ঠ শতকের শেষপাদে সমতটের রাজা ছিলেন। হিউএন সাঙের মতে শীলভদ্র ও কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী বলেছেন, বর্মণ যদি ব্রাহ্মণের কুলবাচী হয়, তাহলে খড়াও ব্রাহ্মণ হতে বাধা নেই এবং খঙ্গ সন্তানের রাজভট্ট নামও এ অনুমানের পরিপূরক। আশরফপুর তাম্রলিপির প্রমাণে খঙ্গদের আমলে সমতটরাজ্য নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমতট শশাঙ্কের সময়ও স্বাধীন ছিল কেননা, হিউএন সাঙ (৬৩৮ খ্রী.) শীলভদ্রকে সমতটের রাজবংশীয় বলেছেন। আর হিউএনসাঙ ও ইৎসিঙ সমতট রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইসিঙের। সহচারী শেঙচি রাজা রাজভট্টের নামও করেছেন। ইৎসিং দেববমের (দেব খঙ্গ?) রাজ্যে শ্রীগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত চীনা-চৈত্য দেখেছিলেন।

২। চন্দ্রবংশ নানা জায়গায় প্রাপ্ত তাম্রপত্র ও মূর্তিলিপির প্রমাণে ও বিদ্বানদের বিশ্লেষণে সমতটের চন্দ্ররাজাদের একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ নাম তালিকা ও রাজত্বের প্রায়-নিশ্চিত সময়কাল নির্ণিত হয়েছে। মনে হয়, গোপচন্দ্র সমাচারদেব এবং আদিত্য, দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গে তথা হরিখেমণ্ডলে রাজত্ব করতেন। আর খড়গরা করতেন সমতটে। সম্ভবত খঙ্গদের পতনের পরে সমতট আরাকানের চন্দ্ররাজাদের অধিকারে আসে। আরাকানীসূত্রে দেখা যায়, বৈশালী নগরের চন্দ্ররা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয় এবং উত্তর আরাকান সম্ভবত মহাবীর ও তার পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে এবং সমতট অঞ্চলে হয় বিতাড়িত চন্দ্ররা অথবা তাদের জ্ঞাতি সামন্ত-শাসক বংশীয়রা প্রায় দেড়শ বছর অবধি রাজত্ব করতে থাকেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে তাদের রাজপরম্পরার একটি পীঠিকা দেওয়া হল :

রাজা —রাজত্বকাল –খ্রীস্টাব্দ ——মন্তব্য

১ পূর্ণচন্দ্র — আনু ৪০ — ৭৮৮-৮২৮ — রাজধানী পাটিকের

২ সবর্ণচন্দ্র – ঐ– ৮২৮-৮৬৮ – ঐ

৩ তৈলোক্যচন্দ্র — ঐ– ৮৬৮-৯০৮ হরিকেল মণ্ডল পতি, কান্তিদেব এঁর আশ্রিত ছিলেন।

৪ শ্রীচন্দ্র – ঐ– ৯০৮-৯৪৮ — দিগ্বিজয়ী, রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন, দ্বিতীয় গোপাল তার হাতে পরাজিত হন।

৫ কল্যাণচন্দ্র — নিশ্চিত রাজত্বকাল ২৪, আনু ৩৫ — ৯৪৮-৯৮৩ — বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

৬ লড়হচন্দ্র — নিশ্চিত : ১৮, আনু. ২৫ — ৯৮৩–১০০৮

৭ গোবিন্দচন্দ্র — নিশ্চিত ২৩, আনু. ৩০ — ১০০৮-১০৩৮ — ইনি চোলরাজ রাজেন্দ্র কর্তৃক (১০২১-২৩ সনে) পরাজিত হন।

৮ আত্মীয় ললিতচন্দ্র — আনু. ৩২ — ১০৩৮-১০৭০

বৈদ্যকশাস্ত্র গ্রন্থ বৃক্ষায়ুর্বেদ, লৌহসর্বস্ব (লৌহ পদ্ধতি) ও শব্দপ্রদীপ লেখক এবং রাজা ভীমপালের চিকিৎসক সুরেশ্বর বা সুরপালের পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালের (১০৭৭-১১২০) এবং তার পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের চিকিৎসক ছিলেন। এই ভিত্তিতে গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্বকাল ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি অনুমান করা সম্ভব। সম্ভবত রাজা দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫) চন্দ্রদের সমতট রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। এঁর বাঘাড়াউড় মূর্তিলিপিই সমতট অঞ্চলে পাল প্রভাবের প্রথম সাক্ষ্য বহন করে। ৫৪ পূর্ণচন্দ্রাদির আমলে বৃক্ষচন্দ্রাদিই হয়তো চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক ছিলেন।

.

৩। হরিখেল

হরিখেল মণ্ডল এলাকা আজো অনির্ণিত। ইৎসিঙের (৭ম শতকের শেষার্ধ) মতে হরিখেল ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চল। কর্পূরমঞ্জরী লেখক রাজশেখরদত্ত (৯ম শতক) হরিখেলকে পূর্বদেশ বলেই পরোক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন।৫৫ যশোধারার জয়মঙ্গলে আছে : বঙ্গালোহিত্যাং পূর্বেন। এসব গুলোই কামরূপ ও সমতট মধ্যস্থ শ্রীহট্টকে নির্দেশ করে।

আবার যাদবানন্দ কবিরাজের রসরূপচিন্তামনি (১৫৯৩ খ্র.) বাসুদেব কবিকঙ্কন চক্রবর্তীর রুদ্রাক্ষ মাহাত্মে (পাণ্ডুলিপি: ঢা. বিশ্ববিদ্যালয়) এবং কেশব কৃত্যসরের কল্পদ্রতে ও আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শ্রীহট্টকেই হরিখেল বলে নির্দেশ করা হয়েছে ৫৬

কিন্তু চীনাসূত্রে এও জানা যায় যে সমতট ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী হরিখেল কোনো উপকূল অঞ্চল। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামনি গ্রন্থে বঙ্গাস্ত হরিখেলিয়: উক্তিতে বঙ্গকেই হরিখেল বলা হয়েছে। আবার নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলপতি কান্তিদেবের অসম্পূর্ণ তাম্রলিপি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে। তাতে দেখা যায় তার রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর। এই বর্ধমানপুরের কোনো ঐতিহ্য সিলেটে কিংবা দক্ষিণবঙ্গে মেলে না। শ্রীচন্দ্রের রামপালে প্রাপ্ত তাম্রপত্রেও হরিশেলের উল্লেখ আছে।

অতএব (ক) সিলেট (খ) ফরিদপুর-বরিশাল-খুলনা প্রভৃতি উপকূল অঞ্চল (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকা–এর যে-কোনো একটি হরিখেল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে খেল < কেল যদি < কের থেকেই হয়ে থাকে তাহলে পাটিকেরর যে-কোনো একপাশেই হরিখেল বিদ্যমান ছিল। আমাদের মনে হয়, দক্ষিণবঙ্গের উপকূলাঞ্চলই হরিখেল ছিল, এখান থেকেই কান্তিদেব সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম জয় করেন, কিন্তু সমতট রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কাছে পরাজিত হওয়ায় তার তাম্রপত্রটি চট্টগ্রামে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এদিকে দক্ষিণবঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপাদি) জয় করে ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজ্যসীমা বিস্তৃত করায় পাটিকের থেকে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ চন্দ্ররাজাদের অধিকারে ছিল। ত্রৈলোক্যচন্দ্র যখন বিক্রমপুরে রাজধানী করেন, তখন তার সামন্ত কুসুমদেব বা তার পিতা পাটিকের অঞ্চল শাসনের ভারপ্রাপ্ত হন। এরই সন্তান ভাবুদেব লড়হ চন্দ্রের সময়ে কারমন্তার শাসক ছিলেন–নটেশ্বর শিবের মূর্তিলিপি থেকে তাই অনুমান করা যায়। চন্দ্ররাজারা দক্ষিণ-দেশীয় রাজাদের দ্বারা বারবার পর্যদস্ত হন। রাজেন্দ্র চোল (১০২১-২৩) গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন বলে তিড়ুমালাই লিপি থেকে জানা যায়, আবার কালকুচি রাজারাও চন্দ্ররাজ্যে বারবার হানা দেন। কোক্কলু (আনু. ৮৪০-৯০) ও তার পৌত্র লক্ষ্মণ রাজা এবং পরবর্তী কালকুচি রাজা কর্ণ (১০৪১-৭০) বঙ্গরাজার উপর জয়ী হয়েছিলেন। বাঘাউড়া লিপির প্রমাণে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপাল সমতটের কতেকাংশ জয় করেছিলেন। কিন্তু এ জয় স্থায়ী হয়নি। ইনি কর্ণ-বিধ্বস্ত বঙ্গ-সমতট জয় করবার সুযোগ পেলে রক্ষা করতে সমর্থ হননি বলেই মনে হয়। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ববঙ্গরাজ জাতবর্মণ কালকুচিরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিয়ে করেছিলেন। কাজেই মহীপালের বিজয়ের সময় কর্ণ ও জাতবর্মণ উভয়েই জীবিত।

Belava তাম্রপত্রের আলোকে অনুমান করা সম্ভব যে ললিত চন্দ্রের স্বল্পকাল (?) রাজত্বের পরেই (কলিঙ্গ দেশজ বা পশ্চিমবঙ্গীয় হরি বর্মণের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের সিদ্ধিলা গায়ের লোক। তার পিতামহ আদিদেব বঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন) উচপদস্থ কর্মচারী বজবর্মণ বা তার পুত্র জাতবর্মণ চন্দ্র সিংহাসন দখল করেন। সম্ভবত ১০৭০ খ্রীস্টাব্দের পরেই বর্মণ অভ্যুত্থান ঘটে। জাতবর্মণ দিগ্বিজয়ী ছিলেন। বৈনর পুত্র পৃথুর গৌরব মুছে দিয়ে, কর্ণের মেয়ে বীরশ্রীকে বিয়ে করে, অঙ্গগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, কামরূপের গর্ব খর্ব করে, দিব্যের বাহুবলকে লজ্জা দিয়ে গোবর্ধনের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়ে এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরকে ধনদান করে তিনি তার সার্বভৌমত্ব বিস্তার করেন।

এই উক্তির মধ্যেকার কালকুচিরাজ কর্ণ ও কৈবর্তদিগের পরিচয় আমরা জানি। এই দিব্য দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে (১০৭০-৭৫) বিদ্রোহী হয়ে বরেন্দ্রে স্বাধীনভাবে কিছুকাল রাজত্ব করার সুযোগ পান। জাতবর্মণের পরে তার পুত্র হরিবর্মণ ও সামলবর্মণ রাজত্ব করেন। এদেরও রাজধানী বিক্রমপুরেই ছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বর্মণদের আদি নিবাস কলিঙ্গে, যেখান থেকে তারা রাঢ়ের সিংগুর অঞ্চলে বাস করতে থাকেন এবং বজ্রবর্মনের আমলে বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। হরিবর্মণের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টরাও রাঢ়বাসী এবং বঙ্গরাজ মন্ত্রী। বর্মণরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। সামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণই Belaoa তাম্রশাসনটি তার রাজত্বের পঞ্চম বছরে রাজধানী বিক্রমপুর থেকে প্রদান করেন। তিনি বারোশতকের প্রথমার্ধেই হয়তো রাজত্ব করেন। ভোজবর্মণের পর আমরা পাট্টিকের রাজ্যের তথা সমতট অঞ্চলের বিশেষ কোনো সংবাদ পাইনে। কেবল রণবঙ্কমলু হরিখেল দেবের (১২০৪-২১) তাম্রশাসনই (১২২১ খ্রী.) পাই। এ তাম্রপত্রে রণবঙ্কম পাট্টিকের-র বৌদ্ধবিহারে ভূমিদান করেছেন।

তিনটি তাম্রশাসনের প্রমাণে বঙ্গ-সমতটে এক দেববংশের রাজত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু হরিখেলদেবের সঙ্গে এ বংশের সম্পর্ক নির্ণয় করবার মতো তথ্য আজো হাতে আসেনি। পুরুষোত্তমদেব, মধুসূদন (মথন) দেব, বাসুদেব, দামোদরদেব, দশরথদেব-এ পাঁচজনের নাম তাম্রশাসন থেকে পাচ্ছি। সম্ভবত এঁরা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের আমলের পাটিকের সামন্ত কুসুমদেবের বংশধর। এবং লখনৌতিতে মুসলিম অধিকারের সুযোগে সমতট অঞ্চলে বর্মণদের পরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। হরিখেলদেব সম্ভবত পুরুষোত্তমের ভাই। তার মৃত্যুর পর পুরুষোত্তমের পুত্র মধুসূদনই সিংহাসন লাভ করেন। দামোদরদেবের মেহের তাম্রলিপি তার রাজত্বের চতুর্থ বছরে তৈরি। অতএব, তাঁর সিংহাসনারোহণ কাল হচ্ছে ১২৩০ খ্রীস্টাব্দ। এতে অনুমান করি মধুসূদন ও তার পুত্র বাসুদেব দশবছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। অরি-রাজা চান্দর মাধব দামোদরদেবের অধিকার যে চট্টগ্রাম অবধি বিস্তৃত ছিল তা তার তাম্রশাসনেই প্রমাণ। দামোদরের পরবর্তী রাজা অরিরাজ দনুজমাধব দশরথদেব (ওফেঁ দনুজ রায়) সেনদের বিক্রমপুরাদি অধিকারেও আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু দশরথদেবকে আমরা (১২৮৩ খ্রীস্টাব্দে) গিয়াসুদ্দীন বলবনের প্রতি (সন্ধিসূত্রে?) আনুগত্য প্রদর্শন করতে দেখি। তাম্রপত্র সূত্রে মনে হয় হয়তো এই বংশেরই গোকুলদেব, নারায়ণদেব, কেশবদেব ও ঈশানদেব সম্ভবত সিলেট অঞ্চলে আরো অনেকদিন স্বাধিকার বজায় রেখেছিলেন।

অতএব এ আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাই :

ক. প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে কিংবা তাম্রপত্রে চট্টগ্রামের নামও মিলে না। Strabo ও Periplus of the Erythrean sea থেকে জানা যায় চট্টগ্রাম খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

খ. খ্রীস্টীয় চার-পাঁচ শতক অবধি আরাকান-চট্টগ্রাম একক অঞ্চলরূপে ছিল। এবং দশশতক অবধি আরাকানে চট্টগ্রামে মহাযান (সর্বাস্তিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী) মত চালু ছিল। তবে তখনো ব্রাক্ষণ্যবাদ ম্লান হয়নি, প্রবলই ছিল। আনোরহটার রাজত্বকালে পগায় রাজকীয় সমর্থনে শিন অরহন গুরুবাদী মহাযান আরি মত উচ্ছেদ করে হীনযানী থেরবাদ (গুরুবাদ) প্রবর্তন করেন। আনোরহটা (১০৪৪-৭৭) আরাকান ও চট্টগ্রামাদি অঞ্চল পট্টিকের-র সীমা অবধি জয় করে সেখানেও থেরবাদ চালু করেন।

গ. চট্টগ্রাম গোড়া থেকেই সম্ভবত আরাকানী শাসনে ছিল। আর নয়শতকের শেষপাদে ৮৭৭ অব্দের পূর্বে কোনো সময়ে সমগ্র সমতট আরাকানী শাসনভুক্ত ছিল। উক্ত সনে বৈশালীর (?) চন্দ্ররা আরাকানে ক্ষমতাচ্যুত হলেন আর পাট্টিকের অঞ্চলে সম্ভবত বৃক্ষচন্দ্রের বংশধর পূর্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয়রা গোটা সমতট বঙ্গ ও হরিখেলে রাজত্ব করতে থাকেন। ময়নামতীতে আরাকান রাজের মুদ্রা মিলেছে।

ঘ. সাত শতকে চট্টগ্রাম সমতটের খদঙ্গরাজ বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইৎসিঙ ও শেঙচির পর্যটনকালে রাজা ছিলেন রাজভট্ট। এ সময়–হিউএন সাঙের মতে-সমতটরাজ্য উত্তরে পুরোনো নিম্নব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে পদ্মানদী। খদঙ্গদের পরেই চন্দ্ররা রাজত্ব করেন।

ঙ. পাহাড়পুরে আট শতকের খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলের মুদ্রা মিলেছে। আরব বণিকেরা সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ-কামরূপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতেন এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

চ. বঙ্গীয়সূত্রে জানা যায়, নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলের বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেব একবার চট্টগ্রামে অধিকার বিস্তার করেন। চট্টগ্রামের এক মন্দিরে তার একটি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কান্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুরা। ফরিদপুর খুলনা প্রভৃতি উপকূলাঞ্চলই সম্ভবত হরিখেল মণ্ডল। এখান থেকেই সমুদ্রপথে হয়তো কান্দিদেব স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রামের অধিকার পান এবং তাম্রপত্র সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বিতাড়িত হন।

ছ. চন্দ্ররাজ শ্রীচন্দ্রের আমলে বৈশালীরাজ চূড়চন্দ্রসিংহ (৯৫১-৫৭) চট্টগ্রাম জয় করতে এসে চিৎ-তৎ-গঙ (যুদ্ধ করা অন্যায়) –এই আপ্তবাণী স্তম্ভে উত্কীর্ণ করে ফিরে যান। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা থুরতন < সুরচন্দ্র (?) তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এমনও হতে পারে যে আনন্দচন্দ্রের পরবর্তী সুরচন্দ্র বাচীর কোনো লোক চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে সুলতান চট্টগ্রামের আরব বণিক শাসক। আবার ত্রিপুরা রাজ্যকেও থুরতন বলা হত।

জ, চূড়চন্দ্র সিংহের চট্টগ্রাম বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সম্ভবত চন্দ্র-সামন্তরাই চট্টগ্রাম শাসন করতে থাকেন এবং জাতবর্মণ আধিপত্য বিস্তার করেন। কেননা, পগারাজ অনোরটা (১০৪৪-৭৭) ১০৫৯ সনে বা তার কিছু পরে উত্তর-আরাকান জয় করেন। অনোরটার রাজ্যের উত্তর পূর্বসীমা ছিল পট্টিকের। পট্টিকের অঞ্চল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। চট্টগ্রামে অনোরটা নিজেই সম্ভবত এসেছিলেন। (He visited the Indian land of Bengal, perhaps Chittagong and planted magical images of men there) চট্টগ্রাম অনোরটা বংশীয়ের দখলে অনেককাল ছিল। একারণেই সীমান্তের পট্টিকের রাজপরিবারের সঙ্গে পগারাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। পট্টিকের-র এক রাজকুমার পগারাজ Kyanzittha–র (১০৮৪-১১১২) কন্যা Sherpe einthi প্রেমে পড়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের কুমারের সঙ্গে একমাত্র সন্তান Shewe-র বিয়ে হলে রাজ্যের অধিকার ভিনদেশী জামাতার হাতে চলে যাবে–এ বিবেচনায় তাকে বিমুখ করা হলে রাজপুত্র আত্মহত্যা করে। আর এই রাজকন্যারই সন্তান রাজা Alaungsithu (১১১২–৬৭) পট্টিকের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। সে কন্যার সৎপুত্র নরথু কর্তৃক হত্যাকাহিনী বর্মা ও আরাকানে ভিন্নভাবে চালু আছে বর্মারাজ ইতিবৃত্তে ও সাহিত্যে এ কাহিনী বিবৃত রয়েছে। Alaungsithu–র বংশধর নরসিংহপতি (১২৫৪–৮৭) ১২৭৭ সনে কুবলাই খানের বাহিনীর সঙ্গে Ngasaunggyan–এ যুদ্ধ করেন। মার্কোপলো বলেছেন Mien–এর রাজার সঙ্গে বাঙলার রাজাও যোগ দিয়েছিলেন এই যুদ্ধে। Hall প্রভৃতি সবাই Marco Polo–র এ স্থলে বাঙলার উল্লেখ করা ভুল হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় Marco Polo স্বয়ং কুবলাই খাঁর দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি বাঙলার যে-পরিচয় দিয়েছেন তাতে অজ্ঞতার ছাপ নেই। কাজেই এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নির্দেশে তার ভুল হওয়ার কথা নয়। সম্ভবত চট্টগ্রামের সামন্তশাসক তখনো পগারাজের অনুগত এবং এ যুদ্ধে সহায়তা করতে বাধ্য ছিলেন। ১২৮৩ সনে দ্বিতীয় মোঙ্গল আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়ে, তার ফলে উত্তর আরাকান (এবং এ সঙ্গে চট্টগ্রামও) স্বাধীন হয়ে যায়। এ সময় পগারাজ্যে মুসলিম প্রভাবও লক্ষণীয়। ঝড়ে বাণিজ্যতরী ভঙ্গ হলে Butta নামে এক আরব বণিক বা নাবিকও এ সময় পগাঁয় বাস করতে থাকেন। এর এবং Raman kan (Rahman Khan) এর দরবারে প্রতিপত্তি ছিল, এ ছাড়া সৈন্যদলে অনেক মুসলিম ও ভারতীয় থাকতো

ঝ. এগারো-বারো শতকে চট্টগ্রাম সম্ভবত পগাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তেরোশতকের প্রথমার্ধে মধুসূদনদেব, বিশেষ করে দামোদরদেবের (১২৪৩) শাসনে ছিল–দামোদরদেবের তাম্রশাসনই তার প্রমাণ। এর পরেও হয়তো পগারাজ চট্টগ্রাম শাসকের আনুগত্য পেতেন, নইলে ১২৭৭ সনে তাকে কুবলাই খানের সঙ্গে যুদ্ধে পগারাজের সহায়করূপে পেতাম না।

ঞ. রাজমালা সূত্রে জানা যায়, ত্রিপুরারাজ ছেঙথুমফা-ই প্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। এ দশশতকের কথা, কিন্তু তার অধিকার স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য রহফা ও তাঁর পিতা বা ভ্রাতার আমলে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা শাসনে ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। পগার বিপর্যয়ের সুযোগে আরাকান রাজ Mihnti প্রবল হয়ে ওঠেন। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন এবং সোনার গাঁয়ের সেন রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করে করদান করতেন। মার্কোপলো এবং ১৩১৩ সনে স্যার জন হার্বার্ট চট্টগ্রাম পর্যটন করেন। হার্বার্ট চট্টগ্রামকে সমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরীরূপে দেখেছেন। Mihnti বা। মেঙদির আমলে উত্তর বঙ্গের চাকমা রাজধানী মাইচাগির (১৩৩৩-৩৪) আরাকান অধিকারে আগে। যুদ্ধে কাঁইচার ত্রিশ হাজার বাঙালি মজুর হিসেবে যোগদান করে।

মধ্যযুগ : প্রাক-মুঘল আমল

(তেরো শতক থেকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি)

ত্রিপুররাজ ছেঙুম ফা সম্ভবত ১২৪০-৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রাজত্ব করতেন। তার আমলেই পার্বত্য ভোটচীনা তিপরা জাতি চট্টগ্রাম জয়৬৮ করে বাঙালার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। সম্ভবত ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বে দামোদর দেব বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে কিংবা আরাকান অথবা ত্রিপুরার সামন্ত হিসাবে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। মনে হয়, তাদের কারো হাত থেকে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রামের অধিকার ছিনিয়ে নেন (১৩৩৮ ৩৯ খ্রী.) চট্টগ্রামের কিংবদন্তিতে এবং শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায় এর সমর্থন আছে। আমাদের ধারণায় ইবন বতুতাও (১৩৪৬ খ্রী.) সদকাউন (Sadkawan) নামে ফখরুদ্দীনের আমলের এই চট্টগ্রামকেই নির্দেশ করেছেন। কবি মুহম্মদ খানের মঞ্জুল হোসেন-এর ভূমিকা ভাগ থেকে জানা যায় ফখরুদ্দীনের আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন কদর বা কদল খান গাজী। তাঁর নামে একটি গ্রাম আজো কদলপুর বলে পরিচিত। এই কদর খানের আমলেই পীর বদরুদ্দীন আলাম ও কবির পূর্বপুরুষ মাহিআসোয়ার আরব বণিক হাজী খলিলের সঙ্গে চট্টগ্রামে উপনীত হন। ফখরুদ্দীন শায়দা নামের এক দরবেশকে চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এ ভণ্ড সাধু ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে নিহত হয়। কবি মুহম্মদ খান গৌড় সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) চট্টগ্রামস্থ কর্মচারী বা প্রতিনিধি রাস্তি খানের বংশধর। তিনি তার পূর্বপুরুষের তালিকা দিয়েছেন :

বদর
আলাম, সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়া, কদর খান, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এবং ইবন বতুতা (১৩৪৬ খ্রী.) চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রায় সমসাময়িক। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে আরাকান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি উপকূল-লগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলের বদরমোকামগুলো স্থানীয় জনগণের উপর পীরবদরের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। চট্টগ্রামের ধর্মীয় ইতিহাসে বদরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবত বিহারের পীর বদরউদ্দীন বদরই আলাম (মৃত্যু ১৩৪০ খ্রী. বর্ধমানের কালনায় যার নকল সমাধি রয়েছে) আর চট্টগ্রামের পীর বদর অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অন্য অনেকের মতে, ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে বদর আলামের মৃত্যু হয়। ইতিহাস ও মুক্তুল হোসেন কাব্য সূত্রে জানা যায় রাস্তি খানের বংশধরগণ ইব্রাহিম ওর্ষে বিরহিম অবধি (ইনিও উজির ছিলেন) গৌড় আরাকান ও ত্রিপুরা রাজার অধীনে (চট্টগ্রাম যখন যে রাজ্যভুক্ত থাকত) চট্টগ্রামের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাস্তি। খান স্বয়ং রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) কর্মচারী ছিলেন।

পরাগল খান ও ছুটিখান ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) ও নুসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রী.) আমলে ফেনী নদী ও রামগড় মধ্যবর্তী সীমান্ত রক্ষী সেনানী বা লস্কর। হামজা খান, নসরত খান ও জালাল খান গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের অধীনে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শিহাবুদ্দীন তালিস ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে মুঘলবিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম বিজয় ও চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা নির্মাণের কথা বলেছেন। তালিস স্বচক্ষে সে রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখেছেন।৭৭ এখনো ফখরুদ্দীনের নামের ফখরুদ্দীনের পথ (ফঅরদ্দীনের অদ) নিশ্চিহ্ন হয়নি। এ রাস্তাও লালমাই অঞ্চল দিয়ে প্রসারিত ছিল।

সেনানী কদর খানের সৈনাপত্যে চট্টগ্রাম বিজয়ও স্বীকার করা চলে।৭৮ (ইনি মালিক পিণ্ডার খান খালজী ওফে কদর খান নন। তিনি নিহত হওয়ার আগে যে কয়মাস সোনারগাঁয়ে ছিলেন, সে সময় বর্ষাকাল ছিল। কাজেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করেননি।)

সম্ভবত ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম গৌড় শাসনে ছিল। পনেরো শতকের গোড়া থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি যে চট্টগ্রাম গৌড়-সুলতানদের অধিকারভুক্ত ছিল তার প্রমাণ বহু :

ক. চীনা দূতের ইতিবৃত্ত ১৪০৯, ১৪১২, ১৪১৫।

খ. আরাকানরাজ নরমিখলের বা মঙ সাউ মঙের গৌড় দরবারে আশ্রয় গ্রহণ (১৪০৪-৩৩ খ্রী.)

গ. চট্টগ্রামে তৈরি দনুজমর্দনদেব গণেশ (১৪১৭), মহেন্দ্র (১৩১৮) ও জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহর (১৪১৫-১৬,১৪১৮-৩১) প্রাপ্ত মুদ্রাই তার সাক্ষ্য। চীনা দূতেরা চট্টগ্রাম হয়েই গৌড়ে গিয়েছিলেন।

আবার চৌদ্দ শতকের রাজনৈতিক খবরও একেবারে বিরল নয়। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দের দিকে ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ চট্টগ্রাম সমেত পূর্ববাঙলার অধিকার লাভ করেন। এর পরে সিকান্দর শাহ (১৩৫৯-৮৯খ্রী.) ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্র.) পনেরো শতকের প্রথম দশক অবধি রাজত্ব করেন। আযম শাহর আমলেই আরাকানরাজ নরমিখলে বা মঙ সাউ মঙ গৌড়ে আশ্রিত হন (১৪০৪ খ্রী.) এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১ খ্রী.) ১৪৩০ খ্রীস্টাব্দে তাকে আরাকান সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আরাকানী বিদ্বানদের মতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহই (১৪৩৩-৫৯) মঙ সাউ মঙকে সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছিলেন (বর্মা রিচার্স সোসাইটিস এ্যানিবারর্সারি ভলিউম ১৯৬০)। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) যে চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন তা কেবল মঙ সাউ মঙের আশ্রয় গ্রহণ থেকেই নয়, বিহারের দরবেশ মুজাফফর শামস বলখী হজ যাত্রার সময় চট্টগ্রাম থেকে তার কাছে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তা হতেও জানা যায়। গিয়াসুদ্দিন চীনদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীনা সূত্রেও ধারণা হয় যে চট্টগ্রাম আযম শাহর অধীনে ছিল। তার পর সইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, গণেশ, মহেন্দ্র, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শামসুদ্দীন আহমদ শাহ এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯) প্রভৃতি সুলতানের আমলেও চট্টগাম গৌড়রাজ্যভুক্ত ছিল। মঙ সাউ মঙের সিংহাসনে আরোহণ (১৪৩০) থেকে আরাকানে মুসলমানদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবল হয়। রাজার মুসলিম নাম, মুদ্রায় কলেমা ও আরবি হরফ তার প্রমাণ। ইলিয়াস শাহ বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে মঙ সাউ মঙের ভাই মঙ খ্রী ওফে আলি খান (১৪৩৪-৫৯) রামুর কিছু অংশ অধিকার করেন। এবং সে সূত্রে আরাকানরাজ গৌড়সুলতানের প্রভাবমুক্ত হন। রামুর যে-অংশ আরাকানরাজের অধীনে গেল সে-অংশ রাজারকুল আর যে-অংশ চাকমা সামন্তের(?) অধিকারে রইল তা চাকমারকুল নামে আজো পরিচিত। মাহমুদ শাহর রাজত্বের শেষ বছরেই (১৪৫৯ খ্র.) চট্টগ্রাম গৌড় সুলতানের হস্তচ্যুত হয়। মঙ খ্রী-পুত্র বসউ পিউ কলিমা শাহ (১৪৫৯-৮২) ১৪৫৯ সনে উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু তার অধিকার দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। তাই রাস্তিখানের উৎকীর্ণ মসজিদ লিপিতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রী.) মাহমুদ শাহর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহকে চট্টগ্রামের অধিপতি দেখি।৮৫ এর পরে এক সময় চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারভুক্ত হয়।

চট্টগ্রামের নিযামপুর ও ফেনী অঞ্চলে শাহজাদা খান্দানী সংক্ষেপে শাহজাদখানী বলে এক সম্ভ্রান্ত বংশের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত শ্রুতি-স্মৃতি থেকে জানা যায়, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে মাতুল কিংবা পিতৃব্য কর্তৃক সিংহাসনে বঞ্চিত হয়ে এক শাহজাদা গৌড়ে এসে মাহমুদ শাহর কন্যা বিয়ে করে চট্টগ্রামের আধুনিক নিযামপুর অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করেন। এক দরবেশ তাকে বলেছিলেন তার হাতী যেখানে লুটিয়ে পড়বে সেখানেই যেন তিনি বসতি করেন। এখানেই হাতী লুটে পড়েছিল বলে স্থানটির নাম হাতী লুটাগাঁ এবং শাহজাদার নাম মাহমুদ ছিল বলে অঞ্চলটি মাহমুদাবাদ নামে অভিহিত হয়। এটিই কি মাহমুদ শাহ কিংবা রুকনউদ্দীন বারবকের টাকাশাল অঞ্চল মাহমুদাবাদ! অবশ্য যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলও মাহমুদাবাদ্য নামে পরিচিত ছিল (হিসটরী অব বেঙ্গল ঢাকা ইউনিভারসিটি ভলিয়ম ২য় পৃ: ১৮৯)। এই শাহজাদার সঙ্গে সাতটি খান্দানী পরিবার আর এদেরই কারো জামাতারূপে বিবাহ-সূত্রে একটি অর্ধ অভিজাত পরিবার এই সাড়ে সাত ঘর আলোচ্য অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করে বলেও লোকশ্রুতি আছে। এদের একজন উসমান কাজি। এদের বংশধরগণ নিযামপুর ও ফেনীর আমিরাবাদ পরগনার বিভিন্ন গায়ে ছড়িয়ে আজো বাস করে। এই শাহজাদা বংশীয় শেখ মুহম্মদ ভূঁইয়া শমসের গাজীর মিত্র ছিলেন। তার কথা শেখ মনোহরের শমসের গাজীনামায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইকিংবদন্তি সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর জামাতা খিজির খান–তুর্কী সংপৃক্ত অথবা শের শাহর ভাগিনেয় মুবারিজ খান ওর্কে সুলতান মুহম্মদ শাহ আদিল কর্তৃক ইসলাম শাহ সুরের পুত্র ফিরোজপুরের হত্যাকাহিনীর সঙ্গে জড়িত।৮৭ এই ফিরোজ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর পুত্রও হতে পারেন। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে পরাগল খান-বংশীয়রাও উক্ত সাড়ে সাত ঘরের একঘর এবং তাঁরা নিজেদের এক উজির জুজার খানের বংশধর বলে দাবী করেন, যদিও পরাগলী মহাভারত সূত্রে আমরা পরাগল খাকে রুদ্র-বংশীয় তথা স্থানীয় দীক্ষিত মুসলিম বংশজ বলে জানি। অবশ্য কবি-প্রযুক্ত রুদ্র অর্থে যোদ্ধা বা বীর ধরলে রাস্তি খান পরাগল খানকে তুর্কী বা আফগান বংশীয় বলেই মানা যাবে।

দ্বিজ ভবানী নাথের রামাভিষেক বা লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় কাব্য ষোলা শতকের প্রথম দশকে জয়ছন্দ বা জয়চান্দ রাজার আগ্রহে রচিত। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে জয় ছন্দ ১৪৮২-১৫২৩ অবধি কর্ণফুলী ও শঙ্খনদ মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আরাকান সামন্ত।৮৮ এ তথ্য নির্ভুল হলে বুঝতে হবে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহর (১৪৭৬-৮২) সময়ে বা তার পরে চট্টগ্রাম গৌড়-সুলতানের হস্তচ্যুত হয়।

অতএব শামসুদ্দীন ইউসুফ কিংবা জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর আমলে চট্টগ্রামে আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম আরাকান শাসনে থাকে। মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের উক্তিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে বলতে হবে চট্টগ্রাম ফতেহ শাহর শাসনাধীনে ছিল না। বিজয় গুপ্ত প্রস্তাবনায় বলেছেন–মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্ সীম। পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর। মধ্যে ফুল্লশী গ্রাম পণ্ডিত নগর। ফতেহ শাহ হোসাইনীর আমলে ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান শাহজাদা ওর্ফে খোঁজা সেরা, সইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ কিংবা শামসুদ্দীন মুজফফর শাহর রাজত্বকালে চট্টগ্রাম আরাকানরাজার শাসনে ছিল। তারপর ১৫১২ সনে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রামের উত্তরাংশ কর্ণফুলী নদী অবধি ছিনিয়ে নেন। এই সময় গৌড়-সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ আলফা হোসাইনী বা আলফা খান নামের এক বণিকের সহায়তায় চট্টগ্রাম দখল করলেন। এরূপে ধন্য মাণিক্যের সঙ্গে হোসেন শাহর বিবাদ উপস্থিত হল। বন্যমাণিক্য আবার সৈন্য পাঠিয়ে ১৫১৩ সনে হোসেন শাহর বাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রামে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুদ্রা তৈর করান :

তারপরে শ্রীধন্য মাণিক্য নৃপবর : চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর। চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল। গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল শ্রীধন্য মাণিক্য তাকে দূর করি দিল।

অথবাঃ চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা। মারণে কাটনে ভঙ্গ দিন গৌড় সেনা।

হোসেন শাহ প্রতিশোধ নেবার জন্যে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করলেন তাঁর সেনাপতি হৈতন খান (হায়াতুন্নবী) ও গৌড়মল্লিক (গৌর মল্লিক) ধন্যমাণিক্যের হাতে পরাজিত হন বটে, কিন্তু তার আগেই তিনি মেহেরকুলাদি অঞ্চল দখল করে মোয়াজ্জমাবাদ শিকভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে এ বিবাদের সুযোগে আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেছিলেন। গৌড় মল্লিককে পরাজিত করে ধন্যমাণিক্যের সাহস বেড়ে গিয়েছিল, তিনি নারায়ণ ও চয়াগের নেতৃত্বে বিপুল বাহিনী নিযুক্ত করলেন। ধন্যমাণিক্য নিজেও এদের সহগামী ছিলেন। (শ্রীধন্যমাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে– রাজমালা)। নারায়ণ রামু অবধি জয় করে রোসাঙ্গ-মর্দন খেতাব লাভ করেন। কিন্তু সম্ভবত কয়েক মাসের মধ্যেই আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুরাধিকার করেছিলেন। আরাকানীদের হাত থেকেই নুসরৎ খান পরাগল খানাদির সহায়তায় উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন। আরাকানরাজ কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদের মধ্যবর্তী চক্রশালায় ঘাঁটি করে গৌড়- সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে সম্ভবত ১৫২৫ সন অবধি দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারের আভাস আছে কবি শাহ বারিদ খানের একটি পদবন্ধে।৯২ নুসরৎ খান পরবর্তী কোনো অভিযানে শঙ্খনদ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামও দখল করেন। দ্য বারোজের বর্ণনায় প্রকাশ Joao de Silviera ১৫১৭ সনে চট্টগ্রাম বন্দরকে গৌড়-সুলতানের দখলে এবং আরাকানরাজকে গৌড়-সুলতানের সামন্ত বলে জেনেছিলেন। আরাকানরাজ মঙইয়াজা বা মঙ রাজা (১৫০১-২৩) এ বিপর্যয়েও আশা ছাড়লেন না। তিনি সেনাপতি ছেদুইজা, মন্ত্রী ছাঙ্গেগ্রী ও রাজকুমার ইরে মঙের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুনরাধিকারের জন্যে ১৫১৭ সনে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। পরাজিত হয়ে চক্রশালার মুসলিম সেনানীশাসক মুরাসিন বা মীর ইয়াসীন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে (সম্ভবত চাঁদপুর হয়ে সোনারগাঁয়ে) আশ্রয় নেন। (রাজোয়াং-রাজবংশ ৯৪)। এরূপে চক্রশালা আরাকান অধিকারে চলে গেল। আরাকানরাজের এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জয় করে লক্ষ্মীপুরে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে এবং ১৫১৪-১৮ সনে আরাকানরাজ ঢাকা ভ্রমণ করেন। কিন্তু আরাকানের এই দিগ্বিজয় স্থায়ী হয়নি। উত্তর চট্টগ্রামেও আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না এ যুদ্ধে। তবু কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর অবধি গোটা অঞ্চল আরাকান শাসনে রয়ে গেল। ১৫২২ সনে ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন। এর ফলে উত্তর চট্টগ্রামবাসী মঘেরা আরাকানে পালিয়ে যায় বলেকিংবদন্তি আছে। একে মঘধাওনী বা মঘ পলায়নী বলে। এ অভিযানে ত্রিপুরার সেনাপতি ছিলেন রায় চাগ। সম্ভবত তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামও আক্রমণ করেন (রাজমালা)। দেবমাণিক্যও চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন নি। এদিকে আরাকান সিংহাসনের তখন নিরাপত্তা ছিল না। গজপতি (১৫২৩-২৫) মঙ সাউ (১৫২৫), থাতাসা (১৫২৫-৩১) প্রভৃতি জ্ঞাতিরা আট বছরের সময় পরিসরে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন। এই দুর্বলতার সুযোগে নুসরৎ শাহ ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ১৫৫৩ সন অবধি গৌড়–সুলতানের শাসনাধীন ছিল।

হোসেন শাহ কিংবা নুসরৎ শাহ নাকি বিজিত চট্টগ্রামের নাম ফতেয়াবাদ রেখে ছিলেন। কিন্তু ফতেয়াবাদ নামের কোনো উল্লেখ কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে নেই। তবে ষোলোশতকে চট্টগ্রাম শহর তথা রাজধানী যে ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল, তা দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু কাব্যে পষ্ট উল্লেখ আছে এবং রাজধানীর নামানুসারে পুরো অঞ্চলটিও ফতেয়াবাদ রূপে পরিচিত ছিল হয়তো। এখনকার চট্টগ্রাম শহরের সাত মাইল দূরে ফতেয়াবাদ গ্রাম আছে। এখানে পুরোনো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান।

ষোলোশতকের মাঝামাঝি কোনো এক নিযাম উত্তর- চট্টগ্রামে জাফরাবাদ গাঁয়ে প্রতাপশালী জমিদার বা আরাকানরাজের সামন্ত ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে দৌলত উজিরের উক্তি থেকে :

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পূর এ সাধ চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ। চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি নৃপতি নিযাম শাহা শূর একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী ধবল অরুণ গজেশ্বর।

ধবল অরুণ গজেশ্বর আরাকানরাজ চট্টগ্রামের সার্বভৌম রাজা, এবং তার অধীনে নিযাম শাহ প্রশাসক–এই অর্থই সঙ্গত। কেননা নৃপতি, শাহ ধবল অরুণ গজেশ্বর প্রভৃতি স্তোক-জ্ঞাপক শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত। ফাজিল নাসির, কবি চুহর, এতিম কাসেম, তমিজী, লোকমান প্রভৃতি কবি উচ্চবিত্তের সাধারণ লোককেও তোয়াজের ভাষায় নৃপতি, সুলতান, অধিপতি বলে অভিহিত করেছেন। কবি মুহম্মদ খানও তার পূর্বপুরুষগণকে স্বাধীন নৃপতিরূপেই বর্ণনা করেছেন। নিমের নামের পরগনা নিযামপুর এখনো বর্তমান। বাহারিস্তান গায়েবীতেও নিযামপুর পরগনার জমিদারের উল্লেখ আছে।

এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানরাজ মঙ বেঙের (যৌবক শাহ ১৫৩১-৫৩) আমলে ত্রিপুরার সৈন্যেরা পার্বত্য পথে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারে ঘন ঘন হানা দিয়ে লুটপাট করত। ১৫৫৩ সনে কয়েক মাসের জন্যে উত্তর চট্টগ্রামও মঙ বেঙের দখলে ছিল, তা চট্টগ্রামে তৈরি তাঁর নামাঙ্কিত প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে প্রমাণিত। আবার গৌড়ের সুর-বংশীয় সুলতান শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজীরও উক্ত সনে চট্টগ্রামে তৈরি মুদ্রা মিলেছে। অতএব ১৫৫৩-৫৪ সনে চট্টগ্রামে কিছুকাল আরাকানী আর কিছুকাল গৌড় শাসন ছিল।

গৌড় ও পর্তুগীজ সূত্রে জানা যায়, ১৫৩৯-৪০ সনে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি খুদাবখশ খান ও হামজা খানের (আমীরজা খান) বিবাদের সুযোগে নোগাজিল (নওয়াজিস, নিযাম, খিজির?) শেরশাহর হয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন। অতএব ১৫৫৩ সনে মঙ বেঙই সম্ভবত উত্তর চট্টগ্রামে হানা দিয়ে তা কিছুকাল দখলে রাখেন।

আরাকান রাজ মঙ বেঙের সময়েই দক্ষিণ চট্টগ্রামে মঘী কানি ও দ্রোনে জমির পরিমাপ পদ্ধতি এবং মঘী সন চালু হয়। মঘী সন বাঙলা সন থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরে কম।

মুহম্মদ খানসুর ওর্ষে শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান গাজী চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে আরাকান আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্ভবত আরাকান বেশিদিন তার দখলে থাকেনি। যদিও আরাকানে তৈরি তাঁর মুদ্রা (৯৬২ হিজরি ১৫৫৩-৪ খ্রী.) মিলেছে। ১৫৫৬ সনে ত্রিপুরারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫২৮ ২৯-১৫৭০ খ্রী.) চট্টগ্রাম অবরোধ করেন:

আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে। (রাজমালা)

এই সময় বিজয় মাণিক্যের পাঠান সৈন্যেরা বিদ্রোহ করলে, তাদের হত্যা করা হয়। গৌড়ের পাঠান সুলতান এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার শ্যালক মুবারকের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বাহিনী প্রেরণ করেন :

এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠান শুনিল।
ক্রোধে গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য দিল রণে
মমারক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল। (রাজমালা)

কিন্তু সম্ভবত পুনরাক্রমণে মুবারক পরাজিত ও ধৃত হয়ে কালী কিংবা চতুর্দশ দেবতার বেদীমূলে বলিরূপে প্রাণ হারান। বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি জয় করে তথায় স্নান করেন। এই ঘটনার স্মারক-মুদ্রা মিলেছে : শ্রী শ্রী লক্ষ্যায়ী বিজয় মাণিক্য দেব] (১৪৮১ শক ১৫৫৯ খ্রী.) মুবারক সম্ভবত মুহম্মদ শাহ গাজীরই শ্যালক। মনে হয়, ১৫৭০ সন অবধি চট্টগ্রাম বিজয়মাণিক্যের শাসনে ছিল। উক্ত সনে সম্ভবত সোলমান কররানী চট্টগ্রাম জয় করেন।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি তথ্য পাচ্ছি :

ক. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬৮২ বা জালালুদ্দীন ফতেহ শাহর (হোসাইনী) আমলে কিংবা তাদের পরের কার গৌড়-সুলতান খোঁজা সেরা, সইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ অথবা শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ–এ কয়জনের যে-কোনো কারো সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-শাসনভুক্ত হয়। শাহ বারিদ খানের পদবন্ধ ও দ্বিজ বা পণ্ডিত ভবানীনাথের লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় এ ধারণার পরিপূরক।

খ. হোসেন শাহ ১৫১২ সনে উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন। ধন্যমাণিক্য ১৫১৩ সনের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন:

চৌদ্দশ পাঁচতিস শকে নিজ বাহুবলে
চাটি গ্রাম বিজই বলি মোহর মারিল (রাজমালা, সাহিত্য পরিষৎ পুথি)

এই বিজয়ের স্মারক চট্টগ্রামজয়ী স্বর্ণমুদ্রা মিলেছে। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই ধন্যমাণিক্য সে অধিকার হারান। ১৫১৩ সনের শেষের দিকে হোসেন শাহর সৈন্য চট্টগ্রাম দখল করে। এতে হোসেন শাহর সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের বিবাদ বাধে। গৌরমল্লিক, হৈতন খান ও হোসেন শাহর নেতৃত্বে তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম দুই যুদ্ধে হোসেন শাহর পরাজয় ঘটে। তৃতীয় যুদ্ধে হোসেন শাহ ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি অবধি হানা দিলেন এবং মেহেরকুল অবধি অঞ্চল মোয়াজ্জমাবাদ পরগনাভুক্ত করে খাওয়াজ খানকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

গ. হোসেন শাহর সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে জয়ী হয়েই ধন্যমাণিক্য পুনরায় নারায়ণ, রায় কছম ও রায় কচাগের (রায় চাগ) নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন-চৌদ্দশ ছত্রিশ শকে চাটিগ্রাম গেল ১৫১৪-১৫ খ্রী.) এবার গৌড়-সুলতানের উত্তর চট্টগ্রাম এবং আরাকানরাজের দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকার করে ত্রিপুরা সৈন্যেরা আরাকানেও হানা দেয়। নারায়ণ এই কৃতিত্বের জন্যে রোসাঙ্গ-মর্দন উপাধি লাভ করেন। কিন্তু হোসেন শাহর পুত্র নুসরৎ খান অচিরে শঙ্খনদ অবধি পুনরুদ্ধার করেছিলেন (১৫১৭ সনের গোড়ার দিকে)। দ্য সিলবেরিয়া তাই ১৫১৭ সনে চট্টগ্রামকে গৌড়-সুলতানের অধিকারে এবং আরাকানরাজকে তার সামন্ত বলে জেনেছিলেন।

ঘ, শ্রীকর নন্দীর উক্তিতে প্রকাশ–ছুটি খান ত্রিপুরাগড় অবধি জয় করে সেখানে সন্নিধান করেছিলেন :

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ। (ছুটিখানী মহাভারত)।

তাহলে আরো একবার ত্রিপুরা বিজিত হয়। আরাকানরাজ মঙরাজা বিপুল বাহিনী পাঠিয়ে সম্ভবত ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর চট্টগ্রাম নুসরৎ খানের হাত থেকে কেড়ে নেন। এবং সন্দ্বীপ, হাতিয়া, যুগদিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জয় করেন। এদিকে দেবমাণিক্য ১৫২২ সনে চট্টগ্রাম দখল করেন। কিন্তু রাখতে পারেন নি। সম্ভবত ১৫২৫ সনের দিকে নুসরৎ শাহ আরাকানের ঘরোয়া বিবাদ ও শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেন। এবং খুদাবখশ খানকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক নিযুক্ত করেন, চকরিয়া ছিল তার শাসনকেন্দ্র। এরপর তা গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহর রাজত্বকাল অবধি (১৫৩৮ খ্র.) স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু রামু প্রভৃতি দক্ষিণ চট্টগ্রামের অবশিষ্টাংশ তখনো আরাকান অধিকারে যে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে চান্দিলা রাজার মন্দিরলিপিতে (১৫৪২ খ্রী.)

ঙ. গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলের চট্টগ্রামস্থ শাসক খুদাবখশ খান ও হামজা খানের (আমীরজা খান) বিবাদের সুযোগ নিয়ে শেরশাহর পক্ষে নোগাজিল চট্টগ্রাম দখল করে নেন। কাজেই ১৫৩৮-এর পরে চট্টগ্রাম ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি শেরশাহ বংশীয়দের হাতে ছিল। তাই দ্য বারোজ চট্টগ্রামকে বাঙলা রাজ্যের ঋদ্ধ বন্দররূপে দেখেছিলেন। ১৫৫৩ সনে মঙ বেঙ সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম দখল করে চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রা বের করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিজয়মাণিক্য মঙবেঙ থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন। পর বৎসর ১৫৫৪ সনে গৌড়-সুলতান মুহম্মদ খান সুর ওরফে শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ

গাজী বিজয়মাণিক্য থেকে উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার কেড়ে নিলেন এবং আরাকান অবরোধ কিংবা অধিকার করে সেখান থেকে মুদ্রা বের করেন (১৫৫৪ খ্রী.) রাজমালার সাক্ষেও প্রমাণ বিজয়মাণিক্য থেকেই পাঠানেরা চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নিয়েছিল।

চ. কিন্তু বিজয়মাণিক্যও দাবী ছাড়েননি। ১৫৫৪-৫৫ সনে কালানাজিরের নেতৃত্বে বিপুল বাহিনী চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়, আট মাসেও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না। অবশেষে গোপনে সুড়ঙ্গ খনন করে সেই সুড়ঙ্গপথে ত্রিপুরার সৈন্যরা চট্টগ্রামের পাঠান দুর্গে প্রবিষ্ট হয়ে পাঠান-সৈন্যদের অতর্কিতে পর্যুদস্ত করে এবং মুবারককে বন্দী করে নিয়ে চন্তাইয়ের পরামর্শে চতুর্দশ দেবতার কাছে বলি দেয়। ত্রিপুরার এ বিজয় সম্ভবত ১৫৫৬ সনে ঘটেছিল। তখন থেকে ১৫৭৩ সন অবধি চট্টগ্রাম ত্রিপুরার দখলে ছিল। চট্টগ্রাম জয় করে বিজয়মাণিক্য লক্ষ্যা নদী অবধি পূর্ববঙ্গও জয় করেন। (মুদ্রা : ১৪৮১ শক, ১৫৫৯ খ্র.)। শ্রী শ্রী লক্ষ্যায়ী বিজয়মাণিক্য দেব: চাটিগ্রাম জয়ী। বিজয় মাণিক্যের এই সুযোগ জুটেছিল মুহম্মদ শাহ গাজী ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর (খিজির খান) মুহম্মদ শাহ আদিল ও তাঁর সুবাদার শাহবাজ খানের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন বলেই (১৫৫৫-৫৭)।

ছ, ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর অনন্ত মাণিক্য সম্ভবত দেড় বছর রাজত্ব করেন (১৫৭১-৭২)। তাকে নিহত করে সেনাপতি উদয় মাণিক্য সিংহাসনে বসেন (১৫৭২)। চৌদ্দশ চুরানব্বই শকে উদয় রাজন। (রাজমালা ২য় খণ্ড পৃ. ৬৯)। এ সময় সোলেমান কররানীরও মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র বায়াজিদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। কাজেই দাউদ খান কররানীই (১৫৭৩ ৭৬) ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নেন (১৫৭৩)। দাউদের সৈন্যেরা বাধা পেল ত্রিপুরার কাছাকাছি খণ্ডলে। কিন্তু ত্রিপুরা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে চলল পাঠান বাহিনী। এর পরে ফিরোজ আন্নী আর জামাল খান পন্নীর নেতৃত্বে দাউদ আরো একদল সৈন্য পাঠালেন চট্টগ্রামে। এই দল মেহেরকুলে ত্রিপুরা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। সম্ভবত পাঁচ মাস ধরে এই যুদ্ধ চলে; পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল পন্নীর সনে। ১৫৭৬ সনে গৌড়ে মুঘল বিজয় ঘটে। কাজেই পাঁচ বৎসর যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পাঁচ মাস হওয়াই সম্ভব। এবারেও দাউদ খাঁর জয় হয়।

আইন-ই আকবরীতে চট্টগ্রামের শেখপুর মহলের অপর নাম সোলায়মানপুর বলে উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সাতটি মহলের কোনোটিই শঙ্খনদের দক্ষিণ তীরে ছিল না; এতে বোঝা যায় দাউদ কররানীও শঙ্খনদ অবধি উত্তর চট্টগ্রামই দখল করেছিলেন। গৌড়ে মুঘল বিজয়ের সুযোগেই সম্ভবত আরাকানরাজ ও মঙ ফালঙ (১৫৭১-৯৩) উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারভুক্ত হওয়ার আগেই কররানীর রেকর্ড থেকেই চট্টগ্রামের মহলগুলো তোডড়মল মুঘল তৌজিভুক্ত করেন। শিহাবুদ্দীন তালিস তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

When Bengal was annexed to the Mughal Empire. Chatgaon was entered in the papers of Bengal as one of the defaulting and unsettled districts. When the Mutasaddis did not really wish to pay any man whose salary was due, they gave him an assignment on the revenue of Chatgaon.
দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকেন্দ্র ছিল রামু। ম্যানরিক ও রালফ ফিচ রামুকে শাসনকেন্দ্র দেখেছেন। রামকোটে তার ধ্বংসাবশেষ আছে।

রাজোয়াঙে বর্ণিত যে রনবী দ্বীপে আরব জাহাজ ভেঙে ছিল, তাও সম্ভবত রামু। সম্ভবত উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরা ও আরাকানে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ চলছিল। এই যুদ্ধে সৈনাপত্য পান ত্রিপুরার রাজকুমার রাজ্যধর। ইনি রামু অবধি অগ্রসর হন। উঁকিয়ার শাসনকর্তা আদমের এলাকার সীমায় আরাকানীরা তাকে বাধা দিল। রসদ যোগাড়ে অসমর্থ হয়ে রাজ্যধর চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আরাকান পক্ষ উঁকিয়ার সামন্তের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে অমর মাণিক্য তা গ্রহণ করেন। রাজ্যধর ত্রিপুরায় চলে গেলে সন্ধিভঙ্গ করে আরাকানীরা চট্টগ্রাম দখল করে। অমর মাণিক্য আবার রাজ্যধরকে পাঠালেন। আরাকানরাজ চালাকি করে গজদন্ত নির্মিত মুকুট উপহার দিয়ে সন্ধির জন্যে দূত প্রেরণ করলেন। রাজ্যধরের সঙ্গে আরো দুইজন রাজপুত্র এসেছিলেন। মুকুটের দাবী নিয়ে তিনজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। আর আরাকানরাজ এ সুযোগে তাদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করলেন। সেনাপতি রাজ্যধর শামুক ফুটে পঙ্গু হলেন। অপর রাজপুত্র যুঝামাণিক্য নিজের মত্ত হাতীর আক্রমণে প্রাণ হারালেন।

এ কাহিনীতে সত্য আছে কিনা জানিনে। তবে ১৫৮৫ সনে রালফ ফিচ চট্টগ্রামকে আরাকান অধিকারে দেখলেও ত্রিপুরার সঙ্গে আরাকানের স্থায়ী সংগ্রামের কথাও শুনেছিলেন। অবশ্য রাজমালা মতে অমর মাণিক্য (সম্ভবত ১৫৮৫ সালে) আরাকানরাজ থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন। আবার আরাকানী সূত্রে জানা যায় ১৫৮৬ সালে রাজা মঙ ফাল ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম জয় করে নেন। আইন-ই-আকবরীর সমাপ্তিকাল ১৫৯৮ সন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে : To the south-east of Bengal is a considerable Tract called Arakan which possesses the port of Chittagong। কাজেই ১৫৯৮ সাল অবধি অন্তত চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারে যে ছিল, তা নিশ্চিত।

জ. আগেই বলেছি রাস্তিখানের সন্তান মীনাখান ও তার বংশধরগণ অন্তত ১৬৬৫ সাল অবধি চট্টগ্রামের শাসনকার্যে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। মীনা খার পৌত্র হামজা খান (মসনদ-ই-আলা– মছলন্দ) গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে (১৫৩৮ খ্রী. অবধি) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। খুদাবখশ খান নামে অপর ব্যক্তিও তার সহকারী বা তার সমকক্ষ অপর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই হামজা খানকে পর্তুগীজরা আমীরজা খান বলে উল্লেখ করেছে। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর সময়ে এ দুইজনের মধ্যে সদভাব ছিল না একজন ছিলেন পর্তুগীজদের বশে, অপরজন পর্তুগীজ-বিদ্বেষী। দুইজনের দ্বন্দ্বের সুযোগে শেরশাহ প্রেরিত নোগাজিল (নিয়াম; খিজিরঃ) সহজেই চট্টগ্রাম দখল করে নিলেন। এ সময় পর্তুগীজ কেপ্টেন সেমপাউ মনস্থির করে কিছুই করতে পারলেন না, ফলে চট্টগ্রাম স্বাধিকারে পাওয়ার সুযোগ হারালেন : Castanheda তাই বলেছেন ...through the folly and indiscretion of Sampayo, the king of Portugal lost Chittagong which could easily have been taken possession of considering that Sher Shah was busily engaged on the other side of bengal.

হামজা খান সম্বন্ধে মঞ্জুল হোসেন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি ত্রিপুরা জয় করেন এবং তিনি পাঠান বিজয়ীও। এতে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। হামজা খান শের শাহর সেনাপতি চট্টগ্রাম বিজেতা নোগাজিলের (নিযাম খিজির?) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই বোধ হয় গৌরব-গর্বী উত্তরপুরুষ মুহম্মদ খানের বর্ণনায় লীলায় পাঠানগণ জিনি পাচ্ছি। আর ১৫৫৩-৫৫ সালে বিজয় মাণিক্যকে বিতাড়িত করেন বলেই কবি করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ লিখেছেন। এতে বোঝা যায় নোগা- জিলের বিজয়ের পরেও তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হামজা খানের পর তাঁর পুত্র নসরত খানও পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। আরাকানী সূত্রে জানা যায়, নসরত খান গৌড়ের পাঠান সুলতানের তথা শামসুদ্দীন বাহাদুর শাহর (ওর্ফে খিজির খান ১৫৫৬-৬০) আমল থেকে সোলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২) আমলের মাঝামাঝি কাল অবধি (১৫৬৯-৭০) চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। কিন্তু নসরত খানের সময় চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধিকারে ছিল–গৌড়ের নয়। ত্রিপুরারাজের উজির নসরত খান আরাকানরাজ সউলাহর (১৫৬৩-৬৪) কাছে আত্মরক্ষামূলক সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করে সউলাহকে ভেট পাঠিয়ে তুষ্ট রাখেন। কিন্তু সউলাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র মঙসিইটা বা মঙসিতা (১৫৬৪-৭১) সম্ভবত নসরত খানের আনুগত্য দাবী করেন। তখন দেয়াঙ্গ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজেরা ছিল আরাকানরাজের বশে। আরাকানরাজের ইঙ্গিতেই নসরত খানের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ বাধে এবং পর্তুগীজদের হাতেই ১৫৬৯-৭০ সালে তিনি প্রাণ হারান। উদয় মাণিক্যের (১৫৮৫-৯৬) সময়ে ঈসা খান সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন

এবং চট্টগ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর বাসভূমি আজো ঈসাপুর নামে পরিচিত। আগেই উল্লেখ করেছি ১৫৮৫-৮৬ সনে আরাকানের ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার রাজকুমার রাজ্যধরের সৈনাপত্যে কয়েকটি যুদ্ধ ঘটে। রামু-চকরিয়ার আরাকানী সামন্ত আদম আরাকানরাজের বিরাগভাজন হয়ে আশ্রয় নিলেন অমর মাণিক্যের। আরাকানরাজ আদমকে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানালে অমর মাণিক্য আশ্রিতকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। এতে তৃতীয়বার ত্রিপুরা বাহিনী চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়। এবার ত্রিপুরা বাহিনীতে পাঠান সৈন্যও (সম্ভবত ঈসা খানের নেতৃত্বে) নিযুক্ত ছিল, তারা দুই লক্ষ আরাকানী সৈন্যের বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং বিশ্বাসভঙ্গ করে ত্রিপুরা সৈন্যদের সম্পদাদি লুট করে পালিয়ে যায়। অমর মাণিক্য এ আকস্মিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঈসাপুর থেকে ধুমঘাট হয়ে পালিয়ে যান এবং অপমানে আত্মহত্যা করেন (১৫৮৬)। মঘেরা রাজধানী উদয়পুর লুট করে সেখানে পনরো দিন অবস্থান করে। তার পর আরাকানরাজ মঙ ফালঙ (১৫৭১-৯৩) যুগদিয়া, আলমদিয়া প্রভৃতি জয় করে ঢাকাও দখল করেন। এভাবে ঢাকা-ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর কতেকাংশ ও চট্টগ্রাম অধিকৃত হওয়ায় আরাকানরাজের গৌরব বৃদ্ধি পেল। এ যুদ্ধে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ উজির (শাসক) নসরত খান-পুত্র জালাল খান গোপনে ত্রিপুরা রাজের সহায়ক ছিলেন। অমর মাণিক্যের পরাজয়ে ও আত্মহত্যার সংবাদে তিনি নাকি ভয়েই প্রাণ হারান (১৫৮৬)। ১৫৮৫ সালে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ কামুও চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা করেন।

জালাল খানের পুত্র, কবি মুহম্মদ খানের পিতৃব্য বিরহিম বা ইব্রাহিম খান চট্টগ্রামে আরাকানী উজির হন (১৫৮৬)। ১৬০৭ সনে Francois pyvard প্যাগানরাজের (আরাকান রাজের) অধীনে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনকর্তা দেখেছেন। ইনি সম্ভবত ইব্রাহিম খান।

কহে ফতে খানে, সখি উপায় আছ নাকি
শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম খান
ভব কল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ সুলতান।

এই ইব্রাহিম যদি উজির ইব্রাহিম খান হন, তবে কবি সৈয়দ সুলতান ও তিনি সমসাময়িক ছিলেন। ফতে খানের অপর পদে আলাউল খানের নাম আছে। এতে মনে হয় ফতে খানের পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতান। উজির ইব্রাহিম খান ছিলেন ফতে খানের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক অর আলাউল ছিলেন তার প্রায় সমবয়সী। ১৫৮৬-১৬০৭ সনের মধ্যে লায়লী মজনু কাব্যোক্ত নিযাম শাহসুর চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন বলে ডক্টর যে অনুমান করেছেন, তা যদি মানতে হয় তাহলে উজির হিসেবে ইব্রাহিম খানের স্থিতি অস্বীকার করতে হবে। জালাল খানের বিশ্বাসভঙ্গের পর থেকে আরাকানরাজের পুত্র কিংবা ভ্রাতা চট্টগ্রামে প্রধান শাসকরূপে নিযুক্ত হতে থাকেন। এবং এটি রেওয়াজে পরিণত হয়। ম্যানরিক (১৬২৯-৩৫) বলেন : The principality of Chittagong belonged by hereditary right to the second son. আরাকানরাজ মঙরাজাগী বা মঙইয়াজাগীর মুসলিম নাম ছিল সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)। তিনি নিজেকে আরাকান, বাঙলা ও ত্রিপুরার নরপতি বলে অভিহিত করতেন। চট্টগ্রামে তৈরি তাঁর মুদ্রায় আরবি, বর্মী ও নাগরী হরফ উত্তীর্ণ করান।

এ যুগটা চট্টগ্রামে পর্তুগীজ প্রাবাল্যের কাল। পরে বিস্তৃতভাবে পর্তুগীজ ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে।

ঝ. ১৬১৬ সালে বাঙলার মুঘল সুবাদার কাসিম খান চট্টগ্রাম বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি নিজে ভুলুয়া অবধি গিয়ে আবদুন নবীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। আবদুন নবী নিযাম-পুরের জমিদারকে বশে এনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আরাকানী সৈন্যেরা বাড়বকুণ্ডের নিকটে কাঠের দুর্গ তৈরি করে তাকে বাধা দিলেন। এ স্থান এখন কাঠগড় নামে পরিচিত। দুই দিন যুদ্ধ হল, মুঘলেরা সুবিধা করতে না পেরে ঢাকার দিকে চলে এল। এ যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে বাহারীস্তান গয়বী গ্রন্থে।

ঞ. ১৬২১ সনে মুঘল সুবাদার ইব্রাহিম খানও চট্টগ্রাম বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি ত্রিপুরা থেকে জঙ্গল পথে (রামগড় পাহাড় হয়ে) এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের বন্ধুরতার অভিজ্ঞতা তার ছিল না বলে অভিযানের চেষ্টা ত্যাগ করে তাকে ফিরতে হল। ১৬২৪ সালে শাহজাদা খুরম যখন সুবাদার ইব্রাহিম খানকে হত্যা করে ঢাকা দখল করেন, তখন আরাকানরাজ সুধর্মার সঙ্গে খুরমের মৈত্রী হয় এবং মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ উপহার বিনিময় হয়। ১৬২৫ সালে বাঙলার সুবাদারের প্ররোচনায় চট্টগ্রামে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে সামন্ত-বিদ্রোহ ঘটে। এ বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এলেন। স্বয়ং সুধর্মা রাজা (১৬২২-৩৮)। তিনি চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে ভুলুয়ায় হানা দেন (১৬২৬) এবং আরো এগিয়ে গিয়ে দোলাই খাল বেয়ে খিজিরপুর ও ঢাকা লুণ্ঠন করে বহু ধন-রত্ন ও বন্দী নিয়ে ফিরে যান। সুবাদার মহব্বত খান কিংবা তার সন্তান খান জাদ খান কোনো বাধাই দিতে পারলেন না (Campos)। ভুলুয়ার থানাদার মির্জা বুগীস ৭০০ অশ্বারোহী ৩০০ রণতরী নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হয়নি।

ট. ১৬৩৮ সালে চট্টগ্রামস্থ আরাকানী শাসনকর্তা মুকুটরায় (Magat Re–সেনাপতি, ফিল্ড মার্শাল) আরাকানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। লোকশ্রুতি এই যে, মুকুটরায়ের পিতা গৌড়েশ্বর রায়ের নিবাস ছিল খণ্ডল পরগনায়। তিনি নাকি চট্টগ্রাম অধিকারের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজের বিরুদ্ধে আরাকানরাজকে সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রামের কদুরখিল গায়ে বসতি নির্মাণ করেন। অপর মতে, সুধর্মা রাজার মৃত্যুর পর তার রাণির প্রেমিক নরপতিণি যখন সিংহাসন দখল করেন, তখন চট্টগ্রামের আরকানী শাসক Magat Re বিদ্রোহী হন। Magat Re আরাকানে হানা দেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ভুলুয়ার মুঘল থানাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর পিছু নিয়ে আরাকানী সৈন্যেরাও যুগদিয়া অবধি অগ্রসর হয়। এখানে সুবাদার ইসলাম খান মসৌদির নৌবাহিনীর সঙ্গে আরাকানীদের যুদ্ধ হয়। আরাকানীরা এ যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কিছুকাল পরে পর্তুগীজদের প্ররোচিত করে এবং নিজেও সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়ে আরাকানরাজ মুঘল শাসিত বাঙলার নানাস্থানে মানুষ ও ধনসম্পদ লুট করাতে লাগলেন। ইসলাম খানের সঙ্গে আরাকানরাজের নৌযুদ্ধও হয়। মুঘলেরা মগ হার্মাদের ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করতে পারেনি। ১৬৬৫ সাল অবধি জলপথে বাঙলা দেশের সর্বত্র অবাধে পীড়ন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এরা। ১৬৬৫ সালের পরেও মগ-ফিরিঙ্গী দস্যুদের হামলা বন্ধ হয়নি, তবে কমে ছিল।

ঠ. আওরঙজীব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সুজা আরাকান-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৬৬০)। তরুণ রাজা চন্দ্র সুধর্মা সুজা-কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। অভিজাত ও মুসলমান সুজা সে-প্রস্তাব চরম অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলে রূপমুগ্ধ, অপমানিত রাজা সুজার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। তিনি সুজাকে দেশত্যাগের ইঙ্গিত দেন, কিন্তু মক্কা পাঠাবার জন্যে প্রতিশ্রুত নৌকা দিতে অসম্মত হন। সুজা আসন্ন বিপদের শঙ্কায় মরিয়া হয়ে উঠলেন এবং আরাকানী মুসলমান ও বাঙালিদের নিয়ে তিনি আরাকান সিংহাসন দখলে প্রয়াসী হন। যথাসময়ে চন্দ্র সুধর্মা এ খবর পেয়ে সানুচর সুজাকে আক্রমণ করেন। সুজা পালিয়ে যান, তার অধিকাংশ অনুচর নিহত হন। তার পরিবার বন্দী হয়। সুজাও পরে ধৃত হয়ে নিহত হন। সুজার দুই মেয়ে আত্মহত্যা করে। এক মেয়ে রাজপরী হওয়ার পর রাজার প্রাণনাশের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে প্রাণ হারান। সুজার তিন পুত্র বন্দী থাকে। বাংলার মুঘল সুবাদার মীর জুমলা সুজার পুত্রদের প্রত্যর্পণের দাবীতে এক ওলন্দাজ বণিককে রোসাঙ্গে দূত পাঠান। সুধর্মা সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং মীর জুমলার হুমকিতে বিরক্ত হয়ে সুজার পুত্রদের হত্যা করেন (১৬৬৩)। সুজার পুত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু বাঙালি মুসলমানকেও রুষ্ট রাজা নির্বিচারে হত্যা করান। সুজা ও সুজা-কন্যার করুণ পরিণতির কাহিনী নিয়ে রচিত গাথা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সংকলিত রয়েছে।

আওরঙজীব এ সংবাদে সম্ভবত অপমানিত বোধ করেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ বাঞ্ছায় শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সনে ২৭ শে জানুয়ারি শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদ খান চট্টগ্রাম দখল করেন। অবশ্য মুঘল বাহিনী এগিয়ে যেয়ে রামু অবধি গোটা চট্টগ্রামই অধিকার করেছিল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় জল-কাদার জীবনে অনভ্যস্ত মুঘল বাহিনী চট্টগ্রামে ফিরে আসে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে আবার আরাকান- অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিকার ১৭৫৬ সাল অবধি বহাল থাকে। আবদুল করিম খোন্দকার রচিত দুল্লা মজলিসে রামুর আরাকানী শাসকের প্রশস্তি আছে। সহস্রেক সাথে শতেক সাত মঘীসনে তথা (১১০৭+ ৬৩৮) ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত। তখনো মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণতীর তথা আধুনিক কক্সবাজার মহকুমা অঞ্চল আরাকান অধিকারে ছিল। সম্ভবত মুঘল সীমান্ত সেনানী আধু খাঁ-ই চট্টগ্রামেরদক্ষিণ প্রান্তে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

ড. ঈসা খান :কিংবদন্তি অনুসারে ভূঁইয়া-শ্রেষ্ঠ ঈসা খান চট্টগ্রামে কিছুকাল আত্মগোপন করে ছিলেন। চট্টগ্রামে তার বাসস্থান ঈসাপুর নামে খ্যাত হয়। এটি এখনো একটি সমৃদ্ধ গ্রাম এবং ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত। ঈসাপুরের পাশেই আছে কবি শা বারিদ খানের পূর্বপুরুষ নানুরাজা মহল্লিকের নামের নানুপুর। ঈসা খান যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন এবং সদর জাহাকে পীর কিংবা বন্ধু করেছিলেন, তা মুক্তল হোসেন কাব্যেও রয়েছে। এমনও অনুমতি হয় যে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ কামু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ঈসা খান (১৫৮৩) ত্রিপুরা রাজ্যান্তর্গত উত্তর চট্টগ্রামে বসতি-বিরল এক গ্রামে বাস করতে থাকেন।কিংবদন্তি অনুসারে ১৫২৫ সালে যখন নুসরৎ শাহ উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন, তখন এই অঞ্চলের আরাকানী মগেরা আরাকান অধিকারে চলে যায়। একে মগ ধাওনী তথা মগ-ধাওয়া বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে উক্ত স্থানটি জনবিরল হয়েছিল। রাজামালা মতে অমর মাণিক্যের সৈনাপত্য করেছেন ঈসা খানই। ঈসা খান চট্টগ্রামে সংগৃহীত সৈন্য দিয়েই সোনারগাঁয়ে মুঘলদের এবং কোচবিহারের রাজাকে পরাজিত করেন।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের ভূমিকা

১৪৯৮ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের উপকূলের সন্ধান পান। তখন থেকেই ভারতের সম্পদে রিক্ত আর অন্তরে ঋদ্ধ হওয়ার পালা শুরু। ১৪৯২ সনে স্পেন থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগীজরা সুদূরের ডাকে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো দিকবিদিকে ছুটে চলল চোখে তাদের আনন্দিত দিনের স্বপ্ন, বুকে তাদের হিম্মত, মাটি তাদের পায়ের নিচে, সমুদ্র তাদের দাঁড়ের আঘাতে বিক্ষত, বাতাস তাদের পালে ধরা, আকাশ তাদের মাথার ছাতা। আরব-ইরানের নামনিশানা রাখবে না তারা নীলসমুদ্রে। কেবল তাদের জাহাজই পাল তুলবে সাতসাগরে। হাঁসের মতো তারাই হবে জলচর। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা দৃঢ়পণ। তাদের নিয়ন্তা হবে লোভ, পাথেয় হবে বাহুবল ও মনের জোর। ন্যায়-নিয়ম-নীতির পরওয়া তারা করবে না। তাই

On reaching portugal the next spring (1499) da Gama advised the king that provided sufficiently strong force were sent, the Moslems could be driven off the sea and the Trade divcerted from the Persian Gulf to the cape route. Emanuel accepted this advice and in the following years put it into operation... built fortresses from Africa to Malacca ...

পর্তুগীজরা গোড়া থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং প্রায় আড়াইশ বছর ধরে সর্বপ্রকার অপকর্মে লিপ্ত ছিল। বাঙালির কাছে পর্তুগীজ তথা হার্মাদ (Armadan) নামটি ত্রাস ও বীভৎসতার প্রতীক। এমন পুরুষানুক্রমিক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে আচরণের নজির ইতিহাসে বিরল। আরো আশ্চর্যের কথা, এর মধ্যেও নাকি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল- There was religious zeal to enslave people and convert them to christianity. Their, abduction, ruin, enslavement, degradation were spiritually an extra-ordinary piece of good fortune for them .. .. Manriqe gives statistics : 3400 persons were kidnapped annually and brought to Dianga. Of these he was able to baptize some 2000 a year. He goes on to say these that it was easier to convince these wretched beings than the residents in the Chittagong Province among whom the annual average of conversion was not more than 400. Their (kidnapped persons) misery and despair did not shock Manriqe because his mind was fixed on saving their soul by baptizing.

এমনিভাবে পর্তুগীজদের কেউ পার্থিব, কেউ অপার্থিব সম্পদ লাভের লোভে পড়ে সহজ স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব হারিয়ে আড়াইশ বছর ধরে মানুষের দেহ-মনের উপর সীমাহীন পীড়ন চালিয়েছে।

গামা ভারতের উপকূলেই নৌকা ভিড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু খবর নিয়ে গিয়েছিলেন তিন সাগরের। বাঙলা সম্বন্ধে (১৪৯৯) রাজার কাছে তার প্রতিবেদন ছিল এরূপ :

Bengal has moorish king and mixed population of Christians and moors, Its army may be about 24000 strong, 10000 being cavlry and the rest infantry with 400 war elephants. The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods, clothes which sell on the spot for 225-6d fetch 90 s. in calicut. It abounds in silver.

পূর্বদেশীয় পর্তুগীজ গভর্নর Albuquerque ১৫১৩ সালে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলকে জানান Bengal requires all our marchandise and is in need of it. কিন্তু আসলে বাঙলার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠে আরো আঠারো-উনিশ বছর পরে।

১৫১৪ সনের উড়িষ্যার পিপলি বন্দরে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। সেখান থেকেই তারা মেদিনীপুরের হিজলী বন্দরে যাতায়াত করত। ১৫১৭ সনে জোয়াও দ্য সিলভীরার নেতৃত্বে প্রথম বাণিজ্যবহর চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হয়। জোয়াও দ্য সিলভীরা বাণিজ্যের অনুমতি লাভের দৌত্য নিয়ে এসেছিলেন। এসেই কিন্তু দুটো স্থানীয় বাণিজ্যতরী লুট করেন। এ নিয়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। কাজেই কুঠি নির্মাণের জন্যে রাজ-অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে যান। ১৫২৮ সন অবধি দ্য সিলভীরা সমুদ্রে অন্যদের বাণিজ্যতরী লুট করতে থাকেন। এর ফলে এদেশের বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটে। এত অপকর্ম করেও পর্তুগীজেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের আশা ছাড়েনি। প্রতি বছর তাদের অন্তত একখানা বাণিজ্য জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসত। আর গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো দ্য কুনহা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চট্টগ্রামে পর্তুগীজের বাণিজ্যাধিকার লাভের জন্যে। ভাসকো ডা গামা যেমন প্রথমবারেই কালিকটে জেলেদের বেঁধে রেখে রাজার থেকে সুবিধে আদায় করে নিয়েছিলেন, এখানেও সে উপায় অবলম্বিত হল।

১৫২৮ সনে পর্তুগীজ কেপ্টেন আফোনসো দ্য মেলোর জাহাজ চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝামাঝি স্থানে ঝড়ের মুখে পড়ে ভেঙে গেল। জেলেরা তাদের উদ্ধার করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসক খুদাবখশ খানের নিকট নিয়ে এল। খুদা বখশ মেলোর সাহায্যে তাঁর এক প্রতিপক্ষকে দমন করেন, এবং ভবিষ্যতে এ

প্রকার কাজে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে মেলোকে বন্দী করে রাখেন। গোঁয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা নুনো দ্য কুনহার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি অরমুজের বণিক খাজা শাহাবুদ্দীনকে পর্তুগীজ কর্তৃক লুণ্ঠিত তার জাহাজ ও পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে বশ করেন। এবং ৩০০০ কুজুণ্ডুস বা টাকা মুক্তিপণ নিয়ে দ্য মেলোকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে খাজা শাহাবুদ্দীনকে দূত করে পাঠালেন গৌড় দরবারে। এ দৌত্য সাময়িকভাবে সফল হল।

১৫৩৩ সনে মেলো আবার পাঁচখানা জাহাজ ও দুইশ অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এলেন। এলেন পথে পথে দেশী ও আরব বাণিজ্যতরী লুট করে করেই। বন্দরে এসে তিনি গৌড়-সুলতান। গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহর কাছে Duarte-de-Azevdo-র নেতৃত্বে বারোজন লোক মারফত বহুমূল্য উপহার পাঠালেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাঙালির জাহাজ থেকে লুটকরা গোলাপজলের পিপাও ছিল। সুলতান লুণ্ঠিত দ্রব্য শনাক্ত করতে পেরে দরবারে প্রেরিত পর্তুগীজদের বন্দী করলেন। সানুচর মেলোকে বন্দী করার জন্যেও নির্দেশ পাঠালেন। ইতিমধ্যেই শুল্ক-ব্যাপারে মেলোর বিবাদও বাধল চট্টগ্রামের শুল্ক-কর্মচারীদের সঙ্গে। সুলতানের নির্দেশ আর এই বিবাদের সুযোগে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা Mello-র সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালেন। তাতে পর্তুগীজদের বিপুল ক্ষতি হল ধনে-প্রাণে। এ সংবাদ পেয়ে পর্তুগীজ শাসনকর্তা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ৩৫০ জন লোক নিয়ে আনতেনিও দ্য সিলভা মেনজিস-এর নেতৃত্বে এক নৌবহর পাঠালেন। মেনজিস চট্টগ্রামে পৌঁছে বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন। মাহমুদ শাহ পর্তুগীজ কারিগর প্রাপ্তির শর্তে–অপর মতে ১৫০০০ পাউন্ড মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু শর্তারোপে রুষ্ট হয়ে মেনজিস চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন লাগিয়ে দেন এবং বহু লোক হত্যা করেন ও বন্দী করে নিয়ে যান। করমণ্ডলের পর্তুগীজ অধ্যক্ষ Diego Rebello ১৫৩৫ সনে সশস্ত্র অনুচর নিয়ে সপ্তগ্রামে আসবার। পথে দুটো আরব বাণিজ্য-জাহাজকে বঙ্গোপসাগর থেকে বিতাড়িত করেন।

তবু শেরশাহর আক্রমণে বিপর্যস্ত মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের হাত করতে প্রয়াসী হলেন। ফলে মেলো ও রেবেলোকে শেরশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগালেন। এই সুযোগে রেবেলো চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ণ অধিকার লাভ করলেন এবং এরূপে আরব ইরানী ও অন্যান্য জাতির চট্টগ্রামের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হল। Villalobos ও জোয়াও কোরিয়ার নেতৃত্বে শেরশাহর বিরুদ্ধে মেলো দুটো নৌবাহিনী দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় মাহমুদ শাহ মেলোকে ৪৫০০০ রী (Reis) এবং পর্তুগীজ সৈন্যদের মাথাপিছু দৈনিক ১০ টাকা করে ভাতা দেন এবং চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে তারা কুঠি নির্মাণ ও শুল্কালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়। এমনকি নুনো ফারনানডেজ Freire এবং জোয়াও কোরিয়া যথাক্রমে চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এর পরে বাঙলায় এলেন কেপ্টেন আফনসো দ্য ব্রাইটো। মাহমুদ শাহর সাহায্যার্থ গোয়া থেকে ভাসকো-ডা সেম্পাও-র নেতৃত্বে নয়টি রণতরী প্রেরিত হয়। এ সময় মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ শাসনকর্তা খুদাবশ খান ও হামজা খানের মধ্যে বিরোধ চলছিল। পর্তুগীজ শুল্কাধ্যক্ষ Fernandez হামজা খানের পক্ষাবলম্বন করেন। এ বিরোধের সুযোগে শেরশাহর সেনাপতি খিজির খান চট্টগ্রাম বন্দরের অধিকার পান। কিন্তু শীঘ্রই সেম্পাও-এর বাহিনী খিজির খার প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। তখন শেরশাহর পক্ষ থেকে পর্তুগীজদের আশ্বাস দেয়া হল, তারা আগের মতো সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে। এতে পর্তুগীজ-অধ্যক্ষ ফারনানডেজ হামজা খানের পক্ষ ত্যাগ করে খিজির খানের তথা শেরশাহর পক্ষ নিলেন। কিন্তু তখনো সেম্পাওর প্রেরিত পর্তুগীজ সৈন্যেরা হামজা খানের পক্ষে ছিল। তারা খিজির খানের অফিসারদের ধরে নিয়ে সেম্পাওর জাহাজে বন্দী করে রাখল। এ বিরোধের ফলে ১৫৪০ সালের দিকে খিজির খানের হাতে পর্তুগীজদের ধন-প্রাণের ক্ষতি হল বিস্তর। এরূপে সেম্পাওর অবহেলা এবং ফারনানডেজের অপরিণামদর্শিতার ফলে চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্তির সুযোগটি পর্তুগীজদের হারাতে হল। অবশ্য পর্তুগীজরা বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি দুটোই সমান চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু ষোলো শতকের শেষাবধি পর্তুগীজেরা বাঙলা দেশে দুর্গাদি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যদিও চট্টগ্রামে (Porto Grando) ও হুগলীতে (galin or porto pequino) তারাই প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যের উপায় করে নিয়েছিল। চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ভূমিকার প্রধান ঘটনাগুলো এই:

ক. ১৫৬৯ সনে Ceasar Frederick সন্দ্বীপে মুসলিম বাসেন্দা ও মুসলিম সুশাসক রাজা দেখে ছিলেন।

খ. ডক্টর জেমস ওয়াইজ-এর মতে ফাদার ম্যানরিক ১৬৩০ সনে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন।

গ. ফ্রানসিস ফারনানডিজ নামে গোয়ানিজ পাদ্রীর বন্দী হিসেবে ১৬০২ সনে চট্টগ্রামের কারাগারে মৃত্যু হয়। আরাকানরাজের পীড়নেই তার মৃত্যু হয়।

ঘ. ১৬০১ সনে যশোরে ও চট্টগ্রামে দুটো জেসুইট মিশন আসে। তখন দেয়াঙ্গে এক গীর্জাও ছিল।

ঙ. ১৬০২ সনে পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আরাকান শাসক কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে সন্দ্বীপে ঘাঁটি করে। সন্দ্বীপ আগে বাকলারাজের শাসনে ছিল, কিন্তু পরে গৌড় শাসনভুক্ত হয়। ১৫৬৫-৮৬ সনের দিকে সন্দ্বীপের মুসলমানেরা পর্তুগীজদের প্রতি প্রীতি ও সৌজন্য রাখত।

চ. বাকলারাজের অনুগত Dominique Carvalho এবং Manuel-de-Mallos–এর যুক্তবাহিনী সন্দ্বীপ দখল করল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আরাকানরাজ তাদের বিতাড়িত করে সন্দ্বীপ পুনরাধিকার করে বাকলা জয় করেন (১৬০২), যশোরে হানা দেন এবং বাংলাদেশ জয়ের হুমকি হাকেন। তখন কারভালহু কিছু অনুচরসহ পালিয়ে শ্রীপুরে আশ্রয় নেন।

ছ. ১৬০৭ সনে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গ দখল করেন। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজ বাসেন্দাদের কিছু নিহত হয়, কিছু মেঘনার দ্বীপাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। এক মুঘল নৌ-অধ্যক্ষ ফতেহ খান সন্দ্বীপ দখল করে মুঘলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনিও পর্তুগীজ আর খ্রীস্টান দাসদের হত্যা করে উচ্ছেদ করেন। এ সময় সাবসটিয়ান গনজালিস টিবাও এবং কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ দেয়াঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। এদিকে ফতেহ খান ১৬৬৫ সনে মুঘল সেনা ইবন হোসেনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন।

জ. দস্যু গনজালিস ক্রমে শক্তিশালী হয়ে সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা হন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেন। আবার আরাকানরাজ-ভ্রাতা আনোপোরমকে বশ করে তার ভগ্নীকে বিয়ে করেন এবং কিছুকাল পরে তাকে হত্যা করে বহু ধনরত্নের মালিক হন। গনজালিস সন্দ্বীপে নয় বছর রাজত্ব করার পরে আরাকানরাজের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যান (১৬১৬) 4016। (Gongales s) sovereignty passed like a shadow. his pride was humbled and his villainies punished. পর্তুগীজরা এরপরে আর কোনোদিন রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করেনি, তবে উপকূলাঞ্চলে অপ্রতিহতভাবে দৌরাত্ম্য করতে থাকে। হার্মাদদের জালিয়া দেখলে মুঘল নওয়ারাও ত্রস্ত হয়ে উঠত।

ঝ, বানিয়ার বলেছেন–(১৬৬৮) St Augustine সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষু Fra goan কয়েক বছর ধরে স্বাধীনভাবে সন্দ্বীপে রাজত্ব করেছেন।

ঞ. বহু পর্তুগীজ শাহ সুজাকে (১৬৬০) আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সহায়তা করেছে। সুজার পরাজয়ে এরা আরাকান থেকে পালিয়ে এসে বাঙলার উপকূলাঞ্চলে (সুন্দরবন, বাকলা ও হুগলী অবধি) ডাকাতি করে বেড়াত।

ট. ফ্রায়ার ম্যানরিক–এর (১৬২৮-৪৩) বর্ণনায় পাই:

১. পর্তুগীজরা আরাকানরাজের অনুমতি নিয়েই দেয়াঙ্গে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। বন্দর করবার জন্যেই পর্তুগীজরা আরাকানরাজ থেকে দেয়াঙ্গ ইজারা নেয়।

২. আরাকানরাজ মুঘলশক্তিকে প্রতিরোধ করবার অভিপ্রায়েই পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তা করতেন, এমনকি এ কার্যে ওদেরকে তিনিই নিযুক্ত করতেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের ও দাসের অর্ধেক পেতেন তিনি।

৩. দেয়াঙ্গে ও তার চারপাশের গায়ে খাঁটি ও সঙ্কর পর্তুগীজের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাতশ। এসব লোক কয়েকটি কম্পানী বা দলে বিভক্ত ছিল। আরাকানরাজ তাদের জায়গীর দিয়েছিলেন। ১৬১৬ সনে সন্দ্বীপের রাজা গনজালিস টিবাও আরাকানে হানা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজদের উপর গোঁয়ার গভর্নর-এর কোনো কর্তৃত্ব চলত না। গনজালিস ও ব্রাইটো নিজেদেরকে গভর্নরের সমকক্ষ বলে দাবী করতেন।

৪. ম্যানরিক যখন দেয়াঙ্গে আসেন, তখন চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন সুধর্মার ভাই। তাঁর মৃত্যুতে নতুন এক শাসক প্রেরিত হন। ১৬০০-১৭ সাল অবধি পর্তুগীজ প্রতাপ অপ্রতিরোধ্য ছিল। তখন The portuguese had dreams of making and unmaking the rulers of Arakan। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবার জন্য আরাকানরাজ দেয়াঙ্গে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজীব দেয়াঙ্গের পেশাদার পর্তুগীজদের ঘুষে ও হুমকিতে বশ করেছিলেন।

ঠ. শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায় আরো কিছু তথ্য মেলে :

১. চট্টগ্রাম দুর্গের ভেতরে একটি টিলায় একটি সমাধি আছে। ঐটি পীর বদরের আস্তানা নামে পরিচিত। মঘেরাও এ সমাধিকে তীর্থরূপে মানে কয়েকখানি গ্রাম এই সমাধির জন্যে ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে।

২. কর্ণফুলীর অপর তীরে চট্টগ্রাম দুর্গের বিপরীত দিকে একটি সুদৃঢ় ও উঁচু দুর্গ আছে। এখানে প্রতিরক্ষার সব উপকরণ মজুত থাকে। আরাকানরাজের বিশ্বস্ত আত্মীয় বা জ্ঞাতি চট্টগ্রামে শাসনকর্তা থাকেন। ১৫৮৬ সন থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়। আরাকানরাজ নিজের নামে চট্টগ্রামে স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করান।

৩. অতীতে বাঙলার সুলতান ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা (আল) তৈরি করিয়েছিলেন, এ রাস্তা শ্রীপুরের বিপরীত দিকে নদীর অপর পার থেকে শুরু। ফখরুদ্দীনের সময়ে নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ছিল চট্টগ্রামে। এগুলোর ভগ্নাবশেষই তার প্রমাণ।

৪. বাঙলার সুলতানদের রাজত্বের শেষের দিকে এবং মুঘল শাসনের প্রথমদিকে বাঙলা দেশে বড় বিশৃঙখলা বিরাজ করত।

Chatgaon again fell into the hands of the Maghs who did not leave a bird in the air or a beast on the land (from Chatgaon) to Jagdia, the frontier of Bengal increased the desolation. Thick-kened the jungles, destroyed the Al and closed the road so well that even the snake and wind could not pass through. They built a strong fort and left a large fleet to guard it. Gaining composure of mind from the strength of the place they turned to Bengal and began to plunder it.

ইব্রাহিম ফতেহ জঙ্গ ব্যতীত কোনো মুঘল সুবাদারই শায়েস্তা খানের আগে এদের দমন করবার চেষ্টা করেননি। ফিরিঙ্গি ও মগ সমন্বিত আরাকানী জলদস্যুরা জলপথে বাঙলাদেশের ভুলুয়া, সন্দ্বীপ, সংগ্রামগড়, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, বাকলা, যশোর, ভূষণা ও হুগলী লুণ্ঠন করত। তারা হিন্দু মুসলিম, নারী-পুরুষ ও বড়-ছোট নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যেত। হাতের তালু ফুঁড়ে বেত চালিয়ে গরু ছাগলের মতো বেঁধে নৌকার পাটাতনে ঠাই দিত। মুরগীকে যেভাবে দানা ছিটিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকেও তেমনি চাউল ছুঁড়ে দেয়া হত খাবার জন্যে। এ অবহেলা ও পীড়নের পরেও যারা বেঁচে থাকত তাদেরকে ভাগ করে নিত মঘে-পর্তুগীজে। মঘেরা অপহৃত লোকদের অবমাননাকর ও শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করত এবং পর্তুগীজেরা অপহৃত ব্যক্তিদের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বেনেদের কাছে দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলোতে, এমনকি তমলুক আর বালেশ্বরেও দাসরূপে বিক্রয় করত।

৫, কর্ণফুলীর মোহনাস্থিত নদীর দক্ষিণতীরে পর্তুগীজ দস্যুঘটির নাম ছিল ফিরিঙ্গি বন্দর। আরাকানরাজ দস্যুবৃত্তির জন্যে নিজের জাহাজ পাঠাতেন না। তিনি ফিরিঙ্গিদের তার চাকুরে মনে করতেন. এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ও দাসের অর্ধেক নিজে নিতেন।

৬. মঘ-ফিরিঙ্গি দস্যুরা এমন ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে মুঘল নওয়ারা বা নৌ-বাহিনীও এদের দেখলে ভয়ে ছুটে পালাত এবং হার্মাদের কবলে পড়ার চাইতে ডুবে মরাই শ্রেয় মনে করত। পর্তুগীজ দস্যুরা হার্মাদ (আরমাদা দেশীয়) নামে পরিচিত ছিল।

৭. ১৬৬৫ সনে আরাকানরাজ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধে। পীড়নের ভয়ে পর্তুগীজেরা মুঘলদের আশ্রয়ে চলে আসে। যুগদিয়া ও নোয়াখালির থানাদার ফরহাদ খান এদের সবাইকে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করলেন। শায়েস্তা খান পর্তুগীজ কেপ্টেনকে হাত করবার জন্যে ২০০০ টাকা ইনাম এবং মাসিক ৫০০ টাকা বেতন ধার্য করে দিলেন। এদের সহায়তা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ইতিহাসের উপকরণ বিরল। ঐতিহাসিক যুগে চট্টগ্রামের কোনো রাজা-বাদশাহ রাজত্ব করেননি। তাই এর কোনো একক ইতিহাস লিখিত হয়নি। শাসকদের ইতিহাসে কেবল প্রাসঙ্গিকভাবেই চট্টগ্রাম সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা খবর মেলে। এসব খবর জড়ো করে চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করা কঠিন কাজ।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে-কয়টি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্য সমাবেশের প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়নি।

এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ হয়েছে। গৌড়ের সুলতানের, ত্রিপুরার হিন্দুরাজার, আরাকানের বৌদ্ধ নৃপতির এবং খ্রীস্টান পর্তুগীজদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক-ক্ষেত্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবন্দর এবং বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রস্টান–এ চারটি ধর্মবিশ্বাসীর আবাসভূমি চট্টগ্রামের মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের, নানা সমস্যার ও বিচিত্র সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ সবকিছুই তাদের মন, মেজাজ ও মননের উপর প্রভাব রেখে গেছে। এমনি বিচিত্র আবহে লালিত চট্টগ্রামী মানুষ ধর্মীয় কোন্দল, জাতিবৈরকে তুচ্ছ জেনে এক উদার অথচ স্বধর্ম ও সংস্কৃতি-নিষ্ঠ মনোভঙ্গির অধিকারী হয়েছিল বলে অনুমান করি। কেননা, মধ্যযুগে চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, এসব গ্রন্থে কোথাও বিদ্বিষ্ট মনের পরিচয় নেই। স্বধর্মী রাজার সঙ্গে সাযুজ্যবোধে কেউ বিধর্মী প্রতিবেশীর প্রতি পীড়ন প্রবণ হয়নি– অন্তত সে-প্রমাণ নেই। স্বতন্ত্র থেকেও তারা সদ্ভাব ও সদিচ্ছা বজায় রাখতে জেনেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য থাকে–এই তত্ত্ব ও আপ্তবাক্য মনে হয়, তাদের জীবনে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এর আভাস মিলবে।